ইউনিট-৩

শব্দ প্রকরণ

পাঠ-৩.১ : পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলায় পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দের প্রকারভেদ লিখতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দের ব্যবহারের নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলা ভাষায় লিঙ্গ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বাংলা ভাষায় পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দকে এক কথায় লিঙ্গ বলা হয়ে থাকে। এই লিঙ্গ শব্দের অর্থ হলো ব্যাকরণিক চিহ্ন বা বিধি, যা দ্বারা একটি লৈঙ্গিক বৈশিষ্টকে নির্দেশ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই লিঙ্গবিধি একেক রকম। অর্থাৎ বিভিন্ন ভাষায় শব্দ প্রকরণে লিঙ্গ বা পুরুষ ও স্ত্রীবাচকতা বোঝানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার রয়েছে। বাংলা ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলা ভাষায় লিঙ্গভেদের এই পার্থক্য সহজেই শব্দ দ্বারা নির্ণয় করা যায়। বিশেষ করে, এ ভাষায় অনেক বিশেষ্য পদ রয়েছে তাদের মধ্যে কোনোটি পুরুষ বুঝায়, আবার কোনোটি দ্বারা প্রকাশিত হয় স্ত্রীবাচকতা। পাঠটিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১. পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দের সংজ্ঞা

সংজ্ঞা : সংক্ষেপে বলা যায়, যে সব শব্দ দ্বারা পুরুষ বোঝায় তাকে বলা হয় পুরুষবাচক শব্দ। এসব শব্দের উদাহরণ হলো ছেলে, ঠাকুর, কাকা, নাপিত, মামা ইত্যাদি। আর যে সব শব্দ দ্বারা স্ত্রী বোঝায় তাকে বলা হয় স্ত্রীবাচক শব্দ। স্ত্রীবাচক শব্দের উদাহরণ হলো বোন, চাকরানী, মা, মামী ইত্যাদি।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়েরমতে, 'জগতে বা প্রকৃতিতে বস্তুসমূহ পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক বা ক্লীব– এই তিন জাতি বা শ্রেণিতে পড়ে। বহু স্থলে ভাষাতেও প্রাকৃতিক অবস্থাঅনুসারে নাম-বাচক শব্দগুলিকেও এই শ্রেণিতে ফেলা হয়। পুরুষ-জাতীয় বস্তুর নামকে পুংলিঙ্গ, স্ত্রী-জাতীয় বস্তুর নামকে স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীব বা নপুংসক জাতীয় বস্তুর নামকে ক্লীবলিঙ্গ বলা হয়।'

মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীরমতে, 'সব ভাষায় লিঙ্গভেদে শব্দ আছে, বাংলা ভাষায়ও আছে। বাংলা ভাষায় বহু বিশেষ্য পদ রয়েছে যাদের কোনোটিতে পুরুষ ও কোনোটিতে স্ত্রী বোঝায়। যে শব্দে পুরুষ বোঝায় তাকে পুরুষবাচক শব্দ, আর যে শব্দে স্ত্রী বোঝায় তাকে স্ত্রীবাচক শব্দ বলে। যেমন– বাপ-মা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে কেউই মৃত্যুর সময় কাছে ছিল না। এ বাক্যে বাপ, ভাই ও ছেলে পুরুষবাচক শব্দ আর মা, বোন ও মেয়ে স্ত্রীবাচক শব্দ।'

বাংলা ব্যাকরণের লিঙ্গ আলোচনায় তৎসম শব্দের প্রভাব বিদ্যমান থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম বাংলা ভাষার লিঙ্গ প্রকরণে প্রযোজ্য হয় না। যেমন– তৎসম পুরুষবাচক শব্দের পুরুষবাচক বিশেষণ এবং স্ত্রীবাচক বিশেষ্য শব্দের স্ত্রীবাচক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– বিদ্বান পুরুষ এবং বিদুষী নারী। এখানে 'পুরুষ' পুরুষবাচক বিশেষ্য এবং 'নারী' স্ত্রীবাচক বিশেষ্য। পাশাপাশি 'বিদ্বান' পুরুষবাচক বিশেষণ এবং 'বিদুষী' স্ত্রীবাচক বিশেষণ। কিন্তু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনেক সময় প্রযোজ্য হয় না। যেমন– সংস্কৃতে সুন্দর বালক ও সুন্দরী বালিকা ব্যবহৃত

হলেও বাংলায় বিশেষণের পরিবর্তন হয় না। বাংলায় ব্যবহৃত হয় যথাক্রমে সুন্দর বালক ও সুন্দর বালিকা। বাংলা ভাষার শব্দভেদ বা লিঙ্গভেদের কারণে এমনটি হয়ে থাকে।

'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ চিহ্ন। এটি সংস্কৃত শব্দ এবং এর ব্যুৎপত্তি হলো লিঙ্গ+অ = লিঙ্গ। লিঙ্গ শব্দের ভিন্ন অর্থ থাকলেও ব্যাকরণে এটি শব্দের শ্রেণিবিশেষ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। লিঙ্গের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– যে সকল শব্দ দ্বারা বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের মধ্যে পুরুষ, স্ত্রী বা ভিন্ন জাতি বোঝায় তাকে লিঙ্গ বলে।

২. বাংলায় পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ ও লিঙ্গের প্রকারভেদ

বাংলা ভাষার পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে; এগুলি হলো– ক) পতি ও পত্নিবাচক অর্থে ব্যবহৃত শব্দ এবং খ) পুরুষ ও মেয়ে বা স্ত্রী জাতীয় অর্থে ব্যবহৃত শব্দ। স্বামী ও পত্নীবাচক অর্থে ব্যবহৃত শব্দের উদাহরণ হলো চাচ-চাচী, মামা-মামী, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ভাই-ভাবী ইত্যাদি। পুরুষ ও মেয়ে বা স্ত্রী জাতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়– পাগল-পাগলী, খোকা-খুকী, মোরগ-মুরগী, বালক-বালিকা দেবর-ননদ ইত্যাদি শব্দ। তবে বাংলা ব্যাকরণে লিঙ্গকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ চার প্রকার লিঙ্গ হলো–

ক) পুংলিঙ্গ খ) স্ত্রীলিঙ্গ গ) ক্লীবলিঙ্গ ও ঘ) উভয়লিঙ্গ

ক) পুংলিঙ্গ : যে সব নামবাচক শব্দের সাহায্যে পুরুষজাতিকে বোঝায়, তাদেরকে বলা হয় পুংলিঙ্গ। এসব নামবাচক শব্দের উদাহরণ হলো– কাকা, চাচা, ছেলে, বালক, নানা, বাবা, গোয়ালা, কিশোর, প্রবীণ ইত্যাদি।

খ) স্ত্রীলিঙ্গ : যে সব নামবাচক শব্দের সাহায্যে স্ত্রীজাতিকে বোঝায়, সেসব শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে। এসব স্ত্রীবাচক শব্দের উদাহরণ হলো– কাকী, মামী, চাচী, মা, আম্মা, কিশোরী, প্রবীণা ইত্যাদি।

গ) ক্লীবলিঙ্গ : যে সব শব্দের সাহায্যে পুরুষ ও স্ত্রীজাতি কোনোটিই বোঝায় না, সেসব শব্দকে বলা হয় ক্লীবলিঙ্গ। এসব শব্দের উদাহরণ হলো– গাছ, পাহাড়, পর্বত, বই, টেবিল, ফুল, ফল, চেয়ার ইত্যাদি।

ঘ) উভয় লিঙ্গ : যে সব শব্দের সাহায্যে স্ত্রী ও পুরুষজাতি উভয়ই বোঝায়, তাকে বলা হয় উভয়লিঙ্গ। উভয়লিঙ্গের উদাহরণ হলো– শিল্পী, ডাক্তার, শিশু, মানুষ, কবি ইত্যাদি।

৩. লিঙ্গ পরিবর্তন বা লিঙ্গান্তরের নিয়ম

বাংলা ভাষার লিঙ্গান্তর নিম্নলিখিতভাবে হয়ে থাকে–

১) পুংলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে প্রত্যয় যোগ করে।

২) স্ত্রীবাচক শব্দ আগে বা পরে বসিয়ে এবং

৩) ভিন্ন শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে।

নিচে নিয়মগুলো উল্লেখ করা হলো।

১) পুংলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে প্রত্যয় যোগ করে :

ক. অ-কারান্ত পুংলিঙ্গের শেষে 'আ' প্রত্যয় যোগ করে লিঙ্গ পরিবর্তন হয়–

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
বৃদ্ধ	বৃদ্ধা	অনাথ	অনাথা
মহাশয়	মহাশয়া	কুটিল	কুটিলা
শিষ্য	শিষ্যা	মনোহর	মনোহরা
উত্তম	উত্তমা	সহোদর	সহোদরা
কৃপণ	কৃপণা	জীবিত	জীবিতা
কোকিল	কোকিলা	আত্মীয়	আত্মীয়া
কুটিল	কুটিলা	প্রিয়	প্রিয়া
মূর্খ	মূর্খা	সুনয়ন	সুনয়না
জটিল	জটিলা	দীন	দীনা

প্রথম	প্রথমা	চতুর	চতুরা
প্রবীণ	প্রবীণা	মাননীয়	মাননীয়া
মলিন	মলিনা	সেবক	সেবিকা
অগ্রজ	অগ্রজা	সুনীল	সুনীলা

খ. পুরুষবাচক শব্দের শেষে -ঈ প্রত্যয় যোগ করে :

অ-কারান্ত এবং আ-কারান্ত বিশেষ্য পদের শেষে -ঈ প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়ে থাকে। যেমন-

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
মানব	মানবী	সাধু	সাধবী
কপোত	কপোতী	সম্রাট	সম্রাজ্ঞী
ত্রয়োদশ	ত্রয়োদশী	নেতা	নেত্রী
তাপস	তাপসী	ময়ূর	ময়ূরী
সুন্দর	সুন্দরী	দানব	দানবী
স্নেহময়	স্নেহময়ী	শূকর	শূকরী
ঈশ্বর	ঈশ্বরী	নদ	নদী
মামা	মামী	একাদশ	একাদশী
ঘটক	ঘটকী	শিয়াল	শিয়ালী
বেটা	বেটী	চতুর্দশ	চতুর্দশী
ষোড়শ	ষোড়শী	তরুণ	তরুণী
দেব	দেবী	নর্তক	নর্তকী
হরিণ	হরিণী	শঙ্কর	শঙ্করী
মৃণ্ময়	মৃণ্ময়ী	সিংহ	সিংহী
দাতা	দাত্রী	সখা	সখী
কিশোর	কিশোরী	চতুর্থ	চতুর্থী
দুলাল	দুলালী	কুমার	কুমারী
রজক	রজকী	নট	নটী
পাগল	পাগলী	নর	নারী

গ. পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'অক' থাকলে তা ইকা করে তার সঙ্গে আ প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করতে হয়–

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
নায়ক	নায়িকা	গায়ক	গায়িকা
বাহক	বাহিকা	সম্পাদক	সম্পাদিকা
সাধক	সাধিকা	প্রচারক	প্রচারিকা
শিক্ষক	শিক্ষিকা	চালক	চালিকা
নাটক	নাটিকা	বালক	বালিকা
প্রেরক	প্রেরিকা	অভিভাবক	অভিভাবিকা

লেখক	লেখিকা	গ্রাহক	গ্রাহিকা
শ্যালক	শ্যালিকা	ঘাতক	ঘাতিকা
পাচক	পাচিকা	ভক্ষক	ভক্ষিকা

ঘ. পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে -আনী প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়-

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
চাকর	চাকরাণী	অরণ্য	অরণ্যানী
মেথর	মেথরাণী	চৌধুরী	চৌধুরাণী
মোঘল	মোঘলানী	নাপিত	নাপিতানী
শূদ্র	শূদ্রাণী	বন	বনানী
পণ্ডিত	পণ্ডিতানী	মাতুল	মাতুলানী

ঙ. কতগুলো পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে -ইনী প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়–

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
গোয়ালা	গোয়ালিনী	বাঘ	বাঘিনী
কাঙাল	কাঙালিনী	ভাগা	অভাগিনী
বিহঙ্গ	বিহঙ্গিনী	চাতক	চাতকিনী
মালী	মালিনী	পাগল	পাগলিনী
সন্ন্যাস	সন্ন্যাসিনী	শ্বেতাঙ্গ	শ্বেতাঙ্গিনী
সাপ	সাপিনী	গোপ	গোপিনী
রজক	রজকিনী	মাতঙ্গ	মাতঙ্গিনী

চ. নিচের পুরুষবাচক শব্দগুলোর শেষে -নী প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়–

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
কামার	কামারনী	জেলে	জেলেনী
ধোপা	ধোপানী	মজুর	মজুরনী
ভিখারী	ভিখারিনী	মায়াবী	মায়াবিনী
ডাক্তার	ডাক্তারনী	ননদাই	ননদিনী
কৃষাণ	কৃষাণী	বেদে	বেদেনী
নাতি	নাতনী	বিদেশী	বিদেশিনী
কুমার	কুমারনী	প্রেত	প্রেতনী

ছ. বান, মান, আন, অতী, য়সী প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়–

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
বিদ্যাবান	বিদ্যাবতি	মহিয়ান	মহিয়সী
মতিমান	মতিয়সী	ভূয়ান	ভূয়সী
শ্রীমান	শ্রীমতি	গরিয়ান	গরিয়সী

জ্ঞানবান	জ্ঞানবতী	শ্রেয়ান	শ্রেয়সী

জ. পুরুষবাচক শব্দের শেষে -ন প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়–

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
নাতি	নাতিন	ঠাকুর	ঠাকুরণ

ঝ. পুরুষবাচক শব্দের সঙ্গে -আইন প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়–

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
বেয়াই	বেয়াইন	হুজুর	হুজুরাইন
দুলহান	দুলহাইন		

ঞ. পুরুষবাচক শব্দের সঙ্গে -বিনী প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়–

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
তেজস্বী	তেজস্বিনী	যশস্বী	যশস্বিনী
পয়স্বী	পয়স্বিনী		

ট. পুরুষবাচক শব্দের শেষে প্রযুক্ত অস, বান, বিন, চর, ইক, নয়, দৃশ, ঈশ শব্দাংশের শেষে -ঈ প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গকরা হয়–

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
গরিয়ান	গরিয়সী	জলচর	জলচরী
ধীমান	ধীমতি	হিতকর	হিতকরী
মানিন	মানিনী	খেচর	খেচরী
মধুকর	মধুকরী	শুভঙ্কর	শুভঙ্করী
প্রেয়স	প্রেয়সী	দয়াময়	দয়াময়ী
মায়াবিন	মায়াবিনী	তাদৃশ	তাদৃশী

২) স্ত্রীবাচক শব্দ আগে বা পরে বসিয়ে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়ঃ

ক. পুরুষবাচক শব্দের আগে বা পরে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়–

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
ভাই	ভাই বৌ	ভাগনে	ভাগনে বউ
সৈন্য	মহিলা সৈন্য	নাতি	নাতি বৌ/নাত বৌ
প্রতিনিধি	মহিলা প্রতিনিধি		

খ. শব্দের আগে বা পরে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ বসিয়ে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়–

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
এঁড়ে বাছুর	বকনা বাছুর	মর্দা উট	মাদী উট
ষাঁড় গরু	গাই গরু	হুল বিড়াল	মাদী/ মেদী বিড়াল
বেটা ছেলে	মেয়ে ছেলে	পুরুষ মানুষ	মেয়ে মানুষ

৩) ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে লিঙ্গ পরিবর্তন করা হয়–

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কুলি	কামিন	ভাই	ভাবী/ বোন
দেবর	ননদ/ জা	বিপত্নীক	বিধবা
পুত্র	কন্যা	খানসামা	আয়া
আব্বা	আম্মা	গোলাম	বাঁদী
পুরুষ/নর	নারী	চাকর	ঝি
সম্রাট	সম্রাজ্ঞী	সাধু	সাধবী
ভূত	পেত্নী	ফুফা	ফুফু
খান	খানম	শূক	শারি
বাদশা	বেগম	বর	কনে
স্বামী	স্ত্রী	খালু	খালা
বিদ্বান	বিদুষী	এঁড়ে	বকনা

৪. স্ত্রীবাচক ও পুরুষবাচক শব্দের জন্য কিছু বিশেষ নিয়ম

ক. যেসব পুরুষবাচক শব্দের শেষে তা রয়েছে, স্ত্রীবাচক বোঝাতে সেসব শব্দে ত্রী হয়। যেমন : নেতা– নেত্রী, কর্তা– কত্রী, শ্রোতা– শ্রোত্রী, ধাতা– ধাত্রী ইত্যাদি।

খ. পুরুষবাচক শব্দের শেষে অত, বান, মান, ঈয়ান থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দ করার জন্য যথাক্রমে অতী, বতী, মতি, ঈয়সী হয়। যেমন : শ্রীমান– শ্রীমতি, গুণবান– গুণবতী, রূপবান– রূপবতী, বুদ্ধিমান– বুদ্ধিমতি ইত্যাদি।

গ. কোনো কোনো পুরুষবাচক শব্দ থেকে বিশেষ নিয়মে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন : বন্ধু-বান্ধবী, নর-নারী, পতি-পত্নী, সম্রাট-সম্রাজ্ঞী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি।

ঘ. নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ : এসব শব্দের পুরুষবাচক রূপ নেই। যেমন– সধবা, বিধবা, সতীন, ললনা, পোয়াতী, লক্ষ্মী, সুজলা, সুফলা, অধীরা, গর্ভিনী, ডাইনী, পেত্নী, শাকচুন্নী, কুলটা, বিমাতা ইত্যাদি।

ঙ. উভয়লিঙ্গ শব্দ : সন্তান, মন্ত্রী, ঋষি, সৈন্য, পুলিশ, শিশু, হাতি, মানুষ, গরু, আমি, তুমি, তুই, আপনি, সে, তিনি,ইনি, উনি, জল, পাখি ইত্যাদি।

চ. কিছু পুরুষবাচক শব্দের দুটো করে স্ত্রীবাচক শব্দ রয়েছে। যথা– দেবর-ননদ (দেবরের বোন)/ জা (দেবরের স্ত্রী), ভাই– বোন এবং ভাবী (ভাইয়ের স্ত্রী), শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী (পেশা অর্থে), এবং শিক্ষক পত্নী (শিক্ষকের স্ত্রী), বন্ধু-বান্ধবী (মেয়ে বন্ধু) এবং বন্ধুপত্নী (বন্ধুর স্ত্রী), দাদা-দিদি (বড় বোন) এবং বৌদি (দাদার স্ত্রী) ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. লিঙ্গ ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?

ক) রূপতত্ত্বে
খ) ধ্বনিতত্ত্বে
গ) বাক্যতত্ত্বে
ঘ) অর্থতত্ত্বে

২. লিঙ্গ কত প্রকার ?

ক) তিন
খ) চার
গ) পাঁচ
ঘ) ছয়

৩. কোনটির লিঙ্গান্তর হয় না?

ক) বেয়াই　　খ) সাহেব

গ) সঙ্গী　　ঘ) কবিরাজ

৪. গরিয়ান শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি?

ক) গরিয়সী　　খ) গরিয়ানী

গ) গরিয়নী　　ঘ) গরিয়াসী

৫. বাংলা ব্যাকরণ কোন পদে সংস্কৃতের লিঙ্গের নিয়ম মানা হয় না?

ক) বিশেষ্য　　খ) বিশেষণ

গ) সর্বনাম　　ঘ) ক্রিয়া

৬. মানুষ কোন লিঙ্গ?

ক) পুংলিঙ্গ　　খ) স্ত্রীলিঙ্গ

গ) ক্লীবলিঙ্গ　　ঘ) উভয়লিঙ্গ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ বলতে কী বোঝেন? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

২. নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দের ৫টি উদাহরণ দিন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক　২. খ　৩. ঘ　৪. ক　৫. খ　৬. ঘ

পাঠ-৩.২ : দ্বিরুক্ত শব্দ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- দ্বিরুক্ত শব্দ বলতে কী বোঝায় তা লিখতে পারবেন।
- দ্বিরুক্ত শব্দের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার লিখতে পারবেন।

একই শব্দের পর পর দুই বার ব্যবহারকে দ্বিরুক্তি শব্দ বলা হয়। কেননা আক্ষরিক অর্থে দ্বিরুক্তি বা দুই বার উক্ত হওয়া। দ্বিরুক্ত শব্দের মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠিত হয়। অর্থাৎ কোনো শব্দের একাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে শব্দের নতুন অর্থ প্রকাশ পায় ও শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে। এ কারণে দ্বিরুক্ত শব্দকে নতুন শব্দ গঠনের উপায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিরুক্ত শব্দের মাধ্যমে কীভাবে বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ তৈরি হয়, তা জানতে হলে এ শব্দ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ প্রয়োজন। এই পাঠে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত দ্বিরুক্ত শব্দসমূহের সাংগঠনিক ও ব্যবহারগত বিষয়ের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

সংজ্ঞা

দ্বিরুক্ত শব্দের অর্থ হলো যা দুইবার উক্ত। কোনো শব্দ বা পদকে পাশাপাশি যদি দুইবার ব্যবহার করে, কিংবা শব্দ বা পদটির পাশাপাশি তার অনুচর শব্দ বা পদ ব্যবহার করা হয়, এই ব্যবহারের ফলে বাক্যে ধ্বনি-মাধুর্য আনা বা অর্থের পরিবর্তন সম্ভব হয়, তাহলে এরূপে ব্যবহৃত শব্দগুলোকে বলা হয় দ্বিরুক্ত শব্দ। যেমন–

পাখিটাকে মরা দেখলাম।

পাখিটাকে মরা মরা অবস্থায় দেখলাম।

দ্বিতীয় বাক্যের 'মরা মরা' দ্বারা মৃত পাখিটিকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, পাখিটার অবস্থা যে মৃত্যুর কাছাকাছি তাই বোঝানো হয়েছে। শব্দের এরূপ ব্যবহারই হলো দ্বিরুক্ত শব্দ বা শব্দদ্বৈত।

দ্বিরুক্ত শব্দ বাংলা ব্যাকরণের রূপতত্ত্ব অংশে আলোচিত হয়ে থাকে। বাংলা ভাষার শব্দগঠনে এসব শব্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

দ্বিরুক্ত শব্দের প্রকারভেদ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত দ্বিরুক্ত শব্দকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

ক. শব্দের দ্বিরুক্তি

খ. পদের দ্বিরুক্তি ও

গ. অনুকার/ধ্বনাত্মক দ্বিরুক্তি

ক) শব্দের দ্বিরুক্তি

একই শব্দ যখন অবিকৃতভাবে দুইবার উচ্চারিত হয় তখন তাকে শব্দের দ্বিরুক্তি বলে। শব্দের দ্বিরুক্তিতে কোনো শব্দের পরিবর্তন হয় না, কেবল অর্থের পরিবর্তন হয়। যেমন– দিন দিন, রোজ রোজ, দিন দিন, কালো কালো, হালকা হালকা, পাকা পাকা ইত্যাদি। শব্দের দ্বিরুক্তি নিম্নোক্তভাবে হতে পারে–

১) একই শব্দ দুইবার ব্যবহারের মাধ্যমে : বছর বছর, বাড়ি বাড়ি, দিন দিন, গাড়ি গাড়ি ইত্যাদি।

২) একই শব্দের সঙ্গে সমার্থক অন্য একটি শব্দ যোগ করে : খেলাধুলা, লালনপালন, ধন-দৌলত ইত্যাদি।

৩) সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দযোগে : ধনী-গরিব, টাকা-পয়সা, লেন-দেন, দেনা-পাওনা ইত্যাদি।

৪) দ্বিরুক্ত শব্দের দ্বিতীয় শব্দের আংশিক পরিবর্তনের মাধ্যমে : রকম-সকম, বকা-ঝকা, মিটমাট, তোড়-জোড় ইত্যাদি

খ) পদের দ্বিরুক্তি

বাক্যে একই পদ বার বার ব্যবহার করাকে বলা হয় পদের দ্বিরুক্তি। বাংলা ভাষায় পদের দ্বিরুক্তির মাধ্যমে নিম্নলিখিত উপায়ে শব্দ গঠন করা হয়–

১) বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্তি : বাংলা ভাষায় বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্তি নিম্নলিখিত অর্থে হয়ে থাকে–

ক) আধিক্য বোঝাতে : রাশি রাশি ধান, থোকা থোকা জাম।

খ) সামান্য বোঝাতে: আমি আজ জ্বর জ্বর অনুভব করছি।

গ) পরম্পরতা বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে : তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ। সে বাড়ি বাড়ি থেকে চাঁদা তুলছে।

ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ বোঝাতে: সে ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে তাকায়।

ঙ) অনুরূপ বোঝাতে : তার সঙ্গী-সাথী কেউ নেই।

চ) আগ্রহ বোঝাতে : সে মা মা বলে কাঁদছে।

২) বিশেষণ পদের দ্বিরুক্তি : বাংলা ভাষায় বিশেষণ পদের দ্বিরুক্তি নিম্নোলিখিত উপায়ে ব্যবহৃত হয়–

ক) আধিক্য বোঝাতে : ভালো ভালো লিচু নিয়ে এসো। পুকুর থেকে বড় বড় মাছ ধর।

খ) তীব্রতা বা সঠিকতা বোঝাতে : গরম গরম জিলাপি খেতে মজা। নরম নরম হাত দিয়ে সে রোগীর সেবা করছে।

গ) সামান্যতা বোঝাতে : কালো কালো চেহারা। পচা পচা আম।

৩) সর্বনাম পদের দ্বিরুক্তি : আধিক্য বা বহুবচন বোঝাতে :

সে সে লোক গেল কোথায়?

কেউ কেউ এ ব্যাপারে ভিন্ন মত দিয়েছেন।

৪) ক্রিয়াবাচক পদের দ্বিরুক্তি : বাংলা ভাষায় ক্রিয়াবাচক পদ নিম্নোক্ত অর্থ প্রকাশে ব্যবহৃত হয়–

ক) বিশেষণরূপে : এত খাই খাই করা ভালো নয়। তোমার নেই নেই ভাব আর গেল না।

খ) স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝাতে : দেখতে দেখতে আকাশে মেঘ জমা হয়ে গেল।

গ) ক্রিয়া-বিশেষণ বোঝাতে : সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখছে। দেখে দেখে যাও।

ঘ) পৌণপুনিকতা বোঝাতে : তোমাকে ডেকে ডেকে আমি হয়রান হয়ে গেলাম।

৫) অব্যয় পদের দ্বিরুক্তি : বাংলা ভাষায় অব্যয় পদের দ্বিরুক্তি নিম্নলিখিত অর্থে ব্যবহৃত হয়–

ক) ভাবের গভীরতা বোঝাতে : হায় হায় করে লাভ কী? ছি, ছি! তুমি কী করছ?

খ) অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে : ভয়ে গা ছম ছম করছে।

গ) ধ্বনি ব্যঞ্জনা বোঝাতে : ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

ঘ) বিশেষণ বোঝাতে : বাতি জ্বলে মিটির মিটির।

গ) অনুকার/ধনাত্মক দ্বিরুক্তি : কোনো কিছুর স্বাভাবিক আওয়াজ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত শব্দকে ধনাত্মক দ্বিরুক্তি বা অনুকার দ্বিরুক্তি বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যেসব ধ্বনিসূচক দ্বিরুক্ত শব্দ কোনো ধ্বনি বা আওয়াজের অনুসারে দ্বিরুক্ত প্রকাশ করে, তাদেরকে অনুকার বা ধনাত্মক অব্যয়ের দ্বিরুক্তি বলে। যেমন– টিপ টিপ, টিক টিক, শন শন, ভন ভন ইত্যাদি। ধনাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দকে তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে–

১) মানুষ বা অন্য প্রাণি, বস্তু বা ক্রিয়া-কর্মের শ্রুতিগ্রাহ্য স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণজাত দ্বিরুক্ত শব্দগুলোকে সাধারণ ধনাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ বা সাধারণ ধনাত্মক শব্দদ্বৈত বলা হয়। যেমন– খল খল, কা কা, ঘেউ ঘেউ, মচ মচ, ঢং ঢং ইত্যাদি।

২) শ্রুতিগাহ্য ধ্বনির ভাব ছাড়া : চোখ, ত্বক, হৃদয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি ভাব প্রকাশক অনুকারজাত দ্বিরুক্তশব্দকে অনুভূতিমুলক ধনাত্মক শব্দদ্বৈত বলে। যেমন– কনকনে, কুসুম কুসুম, টনটন, ছট ফট, দুরু দুরু ইত্যাদি।

৩) কতগুলো ধনাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ দিয়ে স্থায়ী গুণ বোঝানো হয়। এগুলো গুণ প্রকাশক দ্বিরুক্ত শব্দ বলে। যেমন– খাঁ খাঁ, ঝাঁ ঝাঁ, থৈ থৈ ইত্যাদি।

শ্রুতিগাহ্য স্বাভাবিক বা ধনাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ নিম্নলিখিত অর্থ প্রকাশে ব্যবহৃত হয়–

হাসির শব্দ : হি হি, হো হো, খিল খিল, ফিক ফিক ইত্যাদি।

কান্নার শব্দ : হাউ মাউ, ঘ্যান ঘ্যান, প্যান প্যান, মেউ মেউ

কাশির শব্দ : খুক খুক, খক খক, গড় গড়

সম্মতি বা অসম্মতিসূক শব্দ : হ্যা-হ্যা, না-না, হু-হু ইত্যাদি।

অন্যান্য প্রাণির অনুকার : কোকিলের ডাক– কুহুকুহু, কাকের ডাক– কা কা, বানরের ডাক– কিচির মিচির, কুকুরের ডাক– ঘেউ ঘেউ, গাভীর ডাক– হাম্বা-হাম্বা, বিড়ালের ডাক– মিউ মিউ, মাছির ডাক– ভন ভন ইত্যাদি।

বস্তুর ধ্বনির অনুকার : দা, ছুরি, কাচি প্রভৃতি দিয়ে কাটার শব্দ– কচ-কচ, কচাকচ, কট কট, কটাকট, ক্যাচ ক্যাচ, ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ ইত্যাদি।

পড়া, চলা ইত্যাদি ক্রিয়া ধ্বনির অনুকার : ধপ-ধপ, ধপাধপ, ধপাস-ধপাস, টপ-টপ, টপাটপ, পটাস-পটাস, টুপ-টুপ, মট-মট, মড়-মড় ইত্যাদি।

অনুভূতিসূচক ধনাত্মক বা দ্বিরুক্ত শব্দ :

ক) অনুভূতিসূচক : ছম ছম, ম্যাজ ম্যাজ, রি রি, চিন চিন, ধড় পড়, উস খুস।

খ) দৃষ্টির অনুভূতিসূচক : চক চক, ঝল মল, টল টল, টুক টুকে, ডগ ডগে, কুচ কুচে, দগ দগে।

গ) ত্বকের অনুভূতিসূচক : কুট কুট, খস খস, চট চট, হিড় হিড়।

ঘ) গুণ প্রকাশক ধনাত্মক শব্দ : ফিন ফিনে, ঝর ঝরে, থৈ থৈ, লক লকে, ফুর ফুরে।

ধনাত্মক দ্বিরুক্ত গঠন :

১) **একই শব্দের অবিকৃত প্রয়োগ :**টপ টপ, ঝন ঝন, পট পট।

২) **প্রথম শব্দের শেষে আ যোগ করে :** গপাগপ, টপাটপ, পটাপট।

৩) **দ্বিতীয় শব্দের শেষে ই প্রত্যয় যোগ করে :** ধরাধরি, ঝমঝমি, ঝনঝনি।

৪) **যুগ্মরীতিতে গঠিত ধনাত্মক শব্দ :** কিচির মিচির, টাপুর টাপুর, হাপুস হুপুস।

বিশিষ্টার্থক বাগধারায় দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ :

১. ছেলেটিকে চোখে চোখে রেখো। (সতর্কতা)

২. ভুলগুলো তুই আনরে বাছা বাছা । (ভাবের প্রগাঢ়তা)

৩. থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে। (কালের বিস্তার)

৪. লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান। (আধিক্য)

৫. খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে, পরশে মুখে মুখে, নীরবে চোখে চোখে চায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন

১. দ্বিরুক্ত শব্দ কাকে বলে?

ক) একবার উক্ত হয়েছে এমন শব্দ বা পদ
খ) তিনবার উক্ত হয়েছে এমন শব্দ বা পদ
গ) দুবার উক্ত হয়েছে এমন শব্দ বা পদ
ঘ) চারবার উক্ত হয়েছে এমন শব্দ বা পদ

২. জ্বর-এর সাথে কোন শব্দের দ্বিরুক্তিতে সামান্য অর্থ প্রকাশ পায়?

ক) জারি
খ) বিকার
গ) জ্বর
ঘ) ব্যাধি

৩. দ্বিরুক্ত শব্দকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

ক) দুই ভাগে
খ) তিন ভাগে
গ) চার ভাগে
ঘ) পাঁচ ভাগে

৪. রাশি শব্দের দ্বিরুক্তিতে কোন অর্থ প্রকাশ পায়?

ক) সামান্য
খ) আধিক্য
গ) শূন্য
ঘ) আতিশয্য

৫. এখানে লাল লাল ফুল আছে– বাক্যে লাল কী অর্থে দ্বিরুক্ত হয়েছে–

ক) ইষৎ
খ) শূন্য
গ) একবচন
ঘ) বহুবচন

৬. কোন দ্বিরুক্তিটি ধনাত্মক শব্দ?

ক) শন শন
খ) শীত শীত
গ) পড়ো পড়ো
ঘ) হাতে নাতে

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. দ্বিরুক্ত শব্দ বলতে কী বোঝেন? দ্বিরুক্ত শব্দের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

২. বাংলা ভাষায় পদের দ্বিরুক্তির মাধ্যমে ৫টি শব্দ গঠন করুন।

৩. ধনাত্মক দ্বিরুক্তি কাকে বলে? এর বিভিন্ন প্রয়োগ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. গ ৩. খ ৪. খ ৫. ঘ ৬. ক

পাঠ-৩.৩ : সংখ্যাবাচক শব্দ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- সংখ্যাবাচক শব্দের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- সংখ্যাবাচক শব্দ কত প্রকার ও কী কী তা লিখতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় সংখ্যাবাচক শব্দ কীভাবে ব্যবহৃত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংখ্যা বা পরিমাণের একক নির্দেশ করে, এমন শব্দকে বলা হয় সংখ্যাবাচক শব্দ। পৃথিবীর সব ভাষাতেই এই সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার বিদ্যমান। বাংলা ভাষায়ও এরূপ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। বাংলা ভাষার সংখ্যাবাচক শব্দগুলি শব্দ আলোচনায় বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। আলোচ্য পাঠে সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সংজ্ঞা

এক কথায় বলা যায়, যে শব্দ দিয়ে সংখ্যা বোঝায় তাকে সংখ্যাবাচক শব্দ বলে। অঙ্কে, পূরণে, গণনায় ও তারিখ নির্দেশে এসব সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। সংখ্যা মানে গণনা বা গণনা দ্বারা পাওয়া ধারণা। সংখ্যা গণনার মূল একক হলো এক। কাজেই সংখ্যাবাচক শব্দে এক, একাধিক, প্রথম, প্রাথমিক ইত্যাদি ধারণা পাওয়া যায়। যেমন– এক টাকা, দশ টাকা। এক টাকাকে এক এক করে দশবার নিলে দশ টাকা হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সংখ্যা প্রকাশ করে এমন শব্দকে বলা হয় সংখ্যাবাচক শব্দ। অন্যভাবে বলা যায়, যে সব শব্দ দ্বারা সংখ্যা গণনা করা হয়, বা যে শব্দগুলো দ্বারা সংখ্যা বোঝানো হয়, তাকে সংখ্যাবাচক শব্দ বলে। যেমন– ১,২,৩,৪ অথবা এক,দুই, তিন, চার, অথবা পহেলা, দোসরা, তেসরা ইত্যাদি।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ন্যায় বাংলাতেও সংখ্যাবাচক শব্দ রয়েছে। বাংলা সংখ্যাবাচক শব্দগুলোর প্রায়ই তদ্ভব। এর মধ্যে যেসব শব্দ তদ্ভব নয়, তা এসেছে বিদেশি ভাষা থেকে অথবা দেশি শব্দ থেকে। যেমন– কুড়ি (২০) কোল ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, হাজার (১০০০) ফারসি ভাষা থেকে আগত শব্দ।

সংখ্যাবাচক শব্দের প্রকারভেদ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংখ্যাবাচক শব্দগুলোকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে–

ক) অঙ্কবাচক শব্দ– ১,২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ইত্যাদি।
খ) পরিমাণ বা গণনাবাচক শব্দ– এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট ইত্যাদি।
গ) ক্রম বা পূরণবাচক শব্দ– প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ইত্যাদি।
ঘ) তারিখবাচক শব্দ– পহেলা, দোসরা, তেসরা, চৌঠা, পাঁচই, ছয়ই, সাতই, আটই ইত্যাদি।

ক) অঙ্কবাচক শব্দ

যে শব্দ দ্বারা অঙ্কবাচক শব্দ নির্দেশ করা হয় তাকে বলা হয় অঙ্কবাচক শব্দ। আমাদের ভাষায় সংখ্যার একক হলো 'এক'। সুতরাং কোনো শব্দকে ভাঙতে হলে এক সংখ্যাকে একক হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন– তিন টাকা বলতে এক টাকার তিনটি একক বা এককের সমষ্টি বোঝায়। অতএব 'তিন' সংখ্যাকে আমরা ভাঙতে পারি এভাবে এক+এক+এক। এভাবে এক থেকে একশ পর্যন্ত গণনা করা যায়।

এক থেকে একশ পর্যন্ত গণনা করার পদ্ধতিকে বলা হয় দশ গুণোত্তর পদ্ধতি। এক থেকে দশ পর্যন্ত আমরা এভাবে লিখে থাকি : এক (১), দুই (২), তিন (৩), চার (৪), পাঁচ (৫), ছয় (৬), সাত (৭), আট (৮), নয় (৯), দশ (১০)। এখানে যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোকে বলে অঙ্ক। এক থেকে নয় পর্যন্ত অঙ্কে লিখিত। দশ লিখতে এক

লিখে তার ডানে একটি শূন্য (১০) ব্যবহার করতে হয়। এই শূন্যের অর্থ বাম দিকে লিখিত পূর্ণ সংখ্যার দশগুণ। এটিই দশ গুণোত্তর পদ্ধতির নিয়ম।

এ ধরনের প্রতিটি দশকে একক ধরে আমরা বিশ কুড়ি (২০), ত্রিশ (৩০), চল্লিশ (৪০), পঞ্চাশ (৫০), ষাট (৬০), সত্তর (৭০), আশি (৮০), নব্বই (৯০) পর্যন্ত গণনা করা হয়। এরপরের দশকের একককে বলা হয় একশ (১০০)। এভাবে দশের গুণন ও এককের সাহায্যে বিভিন্ন সংখ্যা লেখা যায়। যেমন– এক দশ এক= এগার (১০+১=১১), এক দশ চার চৌদ্দ (১০+৪=১৪) ইত্যাদি।

এভাবে দশকের ঘরে দুই(২) হলে আমরা বলি দুই দশ= বিশ (১০+১০=২০) এবং দুই দশ এক একুশ (১০+১০+১=২১)। এরূপ তিন দশ এক একত্রিশ, চার দশ এক একচল্লিশ, পাঁচ দশ এক একান্ন, ছয় দশ এক একষট্টি ইত্যাদি।

খ) পরিমাণ বা গণনা বাচক সংখ্যা

যে সংখ্যার সাহায্যে পরিমাণ নির্ণয় বা গণনা করা হয় সেসব শব্দকে বলা হয় পরিমাণ বা গণনা বাচক সংখ্যা। অন্যভাবে বলা যায়, একাধিক বার একই একক গণনা করলে যে সমষ্টি পাওয়া যায়, তা-ই পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা। যেমন– সপ্তাহ বলতে আমরা সাতদিনের সমষ্টিকে বুঝিয়ে থাকি। যেমন–

সপ্ত (সাত), অহ (দিনক্ষণ) = সপ্তাহ। এখানে 'দিন' একটি একক। এরূপ সাতটি দিন বা একক মিলে হয়েছে সপ্তাহ।

গুণবাচক সংখ্যাকে আবার পূর্ণসংখ্যা, অধিক ও ন্যূন– এ তিনভাগে ভাগ করা যায়।

'পূর্ণসংখ্যা' বলতে একটি পূর্ণ সংখ্যাকে অপর একটি পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা গুণ করা বুঝায়। যথা–

১ = ১ x ১ ৬ = ৩ x ২ ২ = ২ x ২ ৯= ৩ x ৩ ১২= ৪ x ৩ ১৫= ৫ x ৩

'ন্যূন' বলতে কোনো ভাগের অংশ বুঝায়। যেমন–

১/৪ = চার ভাগের এক ভাগ = চৌথাই, সিকি বা পোয়া
১/৩ = তিন ভাগের এক ভাগ = তেহাই
১/২ = দুই ভাগের এক ভাগ = অর্ধ বা আধা
১/৮ = আট ভাগের এক ভাগ = অষ্টমাংশ ইত্যাদি।

'অধিক' বলতে কোনো সংখ্যা অপর সংখ্যা থেকে ছোট বা বড় বোঝায়। যথা–

সওয়া = ১ ১/৪ (সওয়া বা সোয়া এক) বা সপাদ অর্থাৎ পাদ (+ পোয়া+১/৪ সহ (এক) = সওয়া >সওয়া। এরূপ আড়াই, দেড় ইত্যাদি।

গ) ক্রমবাচক সংখ্যা

একই দল, সারি বা শ্রেণিতে অবস্থিত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যার ক্রম বা পূরণবাচক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়। যেমন– দ্বিতীয়জনকে খবরটি দাও।

এখানে গণনার একজনের পরের লোকটিকে বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়জনের আগের লোকটিকে বলা হয় প্রথম আর পরের লোকটিকে বলা হয় তৃতীয়। এরূপ পরবর্তী ক্রম হলো চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ ইত্যাদি।

ঘ) তারিখবাচক শব্দ

তারিখ বোঝাতে যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয় এক কথায় সেসব শব্দকে বলা হয় তারিখবাচক শব্দ।

বাংলা ভাষায় তারিখবাচক শব্দ রয়েছে। এগুলি বাংলায় প্রতিদিনের তারিখ নির্দেশে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

পয়লা (পহেলা) বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ, তেইশে শ্রাবণ, চব্বিশে বৈশাখ, একুশে ভাদ্র, পহেলা মাঘ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তারিখবাচক শব্দগুলির মধ্যে ১ থেকে ৪ পর্যন্ত হিন্দি নিয়মে সাধিত হয়। নিচে সংখ্যাবাচক শব্দের রূপভেদ উল্লেখ করা হলো–

অঙ্কবাচক	গণনাবাচক	পূরণবাচক	তারিখবাচক	অঙ্কবাচক	গণনাবাচক	পূরণবাচক	তারিখবাচক
১	এক	প্রথম	পয়লা	২	দুই	দ্বিতীয়	দোসরা
৩	তিন	তৃতীয়	তোসরা	৪	চার	চতুর্থ	চৌঠা
৫	পাঁচ	পঞ্চম	পাঁচই	৬	ছয়	ষষ্ঠ	ছয়ই
৭	সাত	সপ্তম	সাতই	৮	আট	অষ্টম	আটই
৯	নয়	নবম	নয়ই	১০	দশ	দশম	দশই
১১	এগারো	একাদশ	এগারই	১২	বারো	দ্বাদশ	বারই
১৩	তেরো	ত্রয়োদশ	তেরই	১৪	চৌদ্দ	চতুর্দশ	চৌদ্দই
১৫	পনেরো	পঞ্চদশ	পনেরই	১৬	ষোলো	ষোড়শ	ষোলই
১৭	সতেরো	সপ্তদশ	সতেরই	১৮	আঠারো	অষ্টাদশ	আঠারই
১৯	উনিশ	উনবিংশ	উনিশে	২০	বিশ	বিংশ	বিশে
২১	একুশ	একবিংশ	একুশে	২২	বাইশ	দ্বাবিংশ	বাইশে
২৪	চব্বিশ	চতুর্বিংশ	চব্বিশে	২৫	পঁচিশ	পঞ্চবিংশ	পঁচিশে
২৬	ছাব্বিশ	ষড়বিংশ	ছাব্বিশে	২৭	সাতাশ	সপ্তবিংশ	সাতাশে
২৮	আটাশ	অষ্টবিংশ	আটাশে	২৯	উনত্রিশ	উনত্রিংশ	উনত্রিশে
৩০	ত্রিশ	ত্রিংশ	ত্রিশে	৩১	একত্রিশ	একত্রিংশ	একত্রিশে
৩২	বত্রিশ	বত্রিংশ	নেই	৩৩	তেত্রিশ	ত্রংত্রিশ	নেই
৩৪	চৌত্রিশ	চর্তুত্রিংশ	নেই	৩৫	পঁয়ত্রিশ	পঞ্চত্রিংশ	নেই
৩৬	ছত্রিশ	ষষ্ঠত্রিংশ	নেই	৩৭	সাইত্রিশ	সপ্তত্রিংশ	নেই
৩৮	আটত্রিশ	অষ্টত্রিংশ	নেই	৩৯	উনচল্লিশ	ঊনচত্বারিংশ	নেই
৪০	চল্লিশ	চত্বারিংশ	নেই	৪১	একচল্লিশ	একচত্বারিংশ	নেই
৪২	বিয়াল্লিশ	দ্বিচত্বারিংশ	নেই	৪৩	তেতাল্লিশ	ত্রিচত্বারিংশ	নেই
৪৪	চুয়াল্লিশ	চতুচত্বারিংশ	নেই	৪৫	পঁয়তাল্লিশ	পঞ্চচত্বারিংশ	নেই
৪৬	ছেচল্লিশ	ষষ্ঠচত্বারিংশ	নেই	৪৭	সাতচল্লিশ	সপ্তসত্বারিংশ	নেই
৪৮	আটচল্লিশ	অষ্টচত্বারিংশ	নেই	৪৯	ঊনপঞ্চাশ	ঊনপঞ্চাশতম	নেই
৫০	পঞ্চাশ	পঞ্চাশতম	নেই	৬০	ষাট	ষষ্ঠিতম	নেই
৭০	সত্তর	সপ্ততিতম	নেই	৮০	আশি	অষ্টতিতম	নেই
৯০	নব্বই	নব্বতিতম	নেই	১০০	একশ	শততম	নেই

ভগ্নাংশবাচক শব্দ

কতগুলো শব্দ দ্বারা কোনো পূর্ণ সংখ্যা না বুঝিয়ে এদের অংশ বুঝায়। এসবশব্দকে বলা হয় ভগ্নাংশবাচক শব্দ। যেমন– ১/২ অর্ধাংশ, ১/৩ এক তৃতীয়াংশ, ১/৬ ষষ্ঠাংশ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. সংখ্যা মানে কী ?

ক) সমষ্টি　　খ) শ্রেণি
খ) গণনা　　ঘ) সবগুলো

২. সংখ্যাবাচক শব্দগুলোকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

ক) দুই ভাগে　　খ) তিনভাগে
গ) চারভাগে　　ঘ) পাঁচভাগে

৩. কোনটি পরিমাণবাচক শব্দ?

ক) একুশ　　খ) একবিংশতি
গ) একবিংশ　　ঘ) একুশে

৪. অঙ্কবাচক সংখ্যা কোনটি?

ক) নয়　　খ) ষষ্ঠ
গ) সপ্তম　　ঘ) আটই

৫. সংখ্যা গণনার মূল একক কোনটি?

ক) এক　　খ) দুই
গ) তিন　　ঘ) চার

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. অঙ্কবাচক ও ক্রমবাচক শব্দের পার্থক্য লিখুন।

২. ১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যার অঙ্কবাচক, গণনাবাচক ও তারিখবাচক রূপ লিখুন।

৩. নিচের সংখ্যাগুলোকে পূরণবাচক শব্দে দেখান।

৩, ৬, ৪, ৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৯, ২০।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ　২. ঘ　৩. খ　৪. ক　৫. ক

পাঠ-৩.৪ : বচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- বচন শব্দটির অর্থ ও সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- বচনের প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বচনের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বচন ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। পারিভাষিক শব্দ মানে হচ্ছে বাংলা ব্যাকরণে 'বচন' শব্দটি শুধু একটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সেটি হচ্ছে 'বচন' পরিভাষা দিয়ে বাংলা ব্যাকরণে নির্দিষ্ট সংখ্যার ধারণার প্রকাশ করা হয়। এই 'নির্দিষ্ট' শব্দটি বিশেষ অর্থ বহন করে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলায় বচন দিয়ে নাম শব্দের একটি বা অনেক সংখ্যাকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচনভেদ হয়। এসব পদে বচন ব্যবহারের কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা পদ্ধতি রয়েছে। এই পাঠে বাংলা ব্যাকরণে ব্যবহৃত বচনের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও ব্যবহার নির্দেশ করা হয়েছে।

অর্থ ও সংজ্ঞা

'বচন' শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। সংস্কৃতে শব্দটির ব্যুৎপত্তি হচ্ছে √বচ+অন। এর সাধারণ অর্থ হলো কথা, বাক্য,উক্তি, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি। কিন্তু ব্যাকরণ শাস্ত্রে এটি 'এক' বা 'বহু' পরিমাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বচনের সংজ্ঞায় বলা হয়– যা দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা নির্দেশ করা হয় তাকে বলা হয় বচন। অন্যভাবে বলা যায়, যা একত্বের বা বহুত্বের ধারণা দেয়, তাকে বলা হয় বচন।

মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী বচনের সংজ্ঞায় বলেন, 'বচন ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সংখ্যার ধারণা। ব্যাকরণে বিশেষ্য বা সর্বনামের সংখ্যাগত ধারণা প্রকাশের উপায়কে বচন বলে।'

জ্যোতিভূষণ চাকী বলেন, 'বচন মানে, যা সংখ্যা বলে দেয়, শব্দের যে রূপের দ্বারা তার সংখ্যা বোধ হয় তাকে বচন বলে।'

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'যাহার দ্বারা পদার্থের সংখ্যার বিষয়ে আমাদের বোধ জন্মে, তাহাকে বচন বলে। বচন–দ্যোতক প্রত্যয় বা শব্দের দ্বারা কোনো বস্তুর একত্ব বোঝা যায়।'

বচনের শ্রেণিবিভাগ

বাংলা ব্যাকরণে বচন দুই প্রকার– ক. একবচন ও খ. বহুবচন।

ক. একবচন

যে বচন বা পরিভাষিক শব্দের সাহায্যে একক কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করা হয় তাকে বলা হয় একবচন। একবচনের উদাহরণ হলো একটি বই, একজন খেলোয়াড়, একটি গোলাপ ফুল, একখানা জামা ইত্যাদি।

১. ***বাক্যে প্রয়োগ***

আদিব একজন খেলোয়াড়, আকিব একজন ছাত্র, সে একটি বই কিনেছে, আমার একখানা ছাতা দরকার ইত্যাদি।

২. একবচনের বৈশিষ্ট্য

একবচনের উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো–

ক) একবচন দ্বারা একক ব্যক্তি বা বস্তু প্রকাশিত হয়। যেমন– এক আসমান, একটি মোবাইল, একজন মানুষ ইত্যাদি।

খ) একবচন প্রকাশের জন্য পৃথক কোনো বিভক্তি নেই। শব্দের মূল রূপটিতেই এককত্ব প্রকাশ পেতে পারে। যেমন– হাঁস, ফুল, ফল, খাতা, চেয়ার ইত্যাদি

গ) শব্দের আগে একটি, একটা, একখানা প্রভৃতি শব্দ যোগ করে এবং বিশেষ্য পদের শেষে টি, টা, খানা, খানি, গাছা, গাছি, ইত্যাগি যোগ করে একবচন বুঝানো হয়। যেমন : কলমটি, কুকুরটা, মুখখানি, মালাগাছি, মেয়েটা, ছেলেটি ইত্যাদি।

খ. বহুবচন

যে বচন বা পারিভাষিক শব্দের সাহায্যে একের অধিক ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়, তাকে বলা হয় বহুবচন। বহুবচনের উদহারণ–

মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। আমাকে দুটি কলম দিন। তিনজন লোক একসঙ্গে গান গাইছে। ইত্যাদি।

বাংলায় বহুবচন প্রকাশের জন্য রা, এরা, গুলি, গুলা, গুলো, দিগ, দের, প্রভৃতি যুক্ত হয় এবং সব, সকল, সমুদয়, কূল, বৃন্দ, বর্গ, নিচয়, রাজি, রাশি, পাল, দাম, নিকর, মালা, আবলি প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। সমষ্টিবোধক শব্দগুলোর অধিকাংশই তৎসম বা সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত।

একবচন থেকে বহুবচন প্রকাশের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়ম মেনে চলা হয়–

১. রা, এরা, গুলি, গুলা, গুলো ইত্যাদি বহুবচন প্রকাশক প্রত্যয় একবচনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহুবচন প্রকাশ করে। যেমন– বালকেরা, মেয়েরা, ছেলেরা, কুমড়াগুলো, কাকগুলি, আমগুলো ইত্যাদি।

উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের শব্দের সঙ্গে রা বিভক্তি ব্যবহার করা হয়। যেমন–

শ্রমিকেরা কাজ করছে। তারা সবাই একসঙ্গে একে অপরকে সাহায্য করে। শিক্ষকেরা জ্ঞান দান করেন।

মনে রাখতে হবে, 'রা' এবং 'এরা' একই অর্থ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'রা' এবং 'এরা' ব্যবহারের নিয়ম রয়েছে। স্বরান্ত শব্দের শেষে রা ব্যবহৃত হয়। যেমন– ছেলেরা, মেয়েরা ইত্যাদি। অন্যদিকে, ব্যঞ্জনান্ত শব্দের শেষে রা যুক্ত হয়। যেমন– বালকেরা, মানুষেরা, পুরুষেরা ইত্যাদি।

তবে কবিতা বা অন্যান্য প্রয়োজনে অপ্রাণি ও ইতর প্রাণিবাচক শব্দেও রা, এরা যুক্ত হয়। যেমন– পাখিরা আকাশে উড়ে দেখিয়া হিংসায় পিপীলিকারা বিধাতার কাছে পাখা চায়। কাকেরা এক বিরাট সভা করল ইত্যাদি।

গুলা, গুলি, গুলো– এই তিনটি বদ্ধরূপমূলের মধ্যে 'গুলা' আঞ্চলিক বাংলায় ব্যবহৃত হয় এবং 'গুলি', 'গুলো' মান বাংলায় ব্যবহৃত হয়। গুলি, গুলো বদ্ধরূপমূল দুটি প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে যুক্ত হয়। যেমন– অতগুলো আম কোথায় পেলে? টাকাগুলো আমাকে দাও। কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করছে ইত্যাদি।

২. উন্নত প্রাণিবাচক মানুষ প্রকাশক বহুবচনে নিম্নলিখিত বদ্ধরূপমূল ব্যবহৃত হয়–

গণ : জনগণ, শিক্ষকগণ, দেবগণ, নরগণ ইত্যাদি।

বৃন্দ : শিক্ষকবৃন্দ, সুধীবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ ইত্যাদি।

মণ্ডলি : সম্পাদকমণ্ডলি, শিক্ষকমণ্ডলি ইত্যাদি।

বর্গ : পণ্ডিতবর্গ, মন্ত্রিবর্গ ইত্যাদি।

৩. শব্দের আগে অনেক, সব ইত্যাদি ব্যবহার করে বহুবচন প্রকাশ করা হয়। যেমন– সব কথা শুনতে নেই। অনেক লোক এখানে সমবেত হয়েছে।

৪. ইতর প্রাণিবাচক শব্দের শেষে এরা, সমূহ, সকল, সম, পাল, কুল, ব্যবহার করে একবচন থেকে বহুবচন করা হয়। যেমন– গরুগুলি, পাখিরা, পাখিসব, বাচ্চাগুলো, গরুরপাল ইত্যাদি।

৫. বস্তুবাচক শব্দের শেষে সমূহ, সকল, রাজি, গুচ্ছ, মালা, রাশি, পুঞ্জ ইত্যাদি যোগ করে বহুবচন প্রকাশ করা হয়। যেমন– বইসমূহ, বৃক্ষরাজি, পুষ্পগুচ্ছ, কেশরাশি, মেঘপুঞ্জ ইত্যাদি।

৬. সংখ্যা বা পরিমাণ বুঝায় এমন শব্দের শেষে অজস্র, প্রচুর, ব্যাপক, বেশুমার, বেশি ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করে বহুবচন প্রকাশ করা হয়। যেমন– প্রচুর ধনসম্পত্তি, প্রচুর পানি, প্রচুর আয়োজন, ব্যাপক আয়োজন, বেশুমার লোক ইত্যাদি।

৭. সংখ্যাবাচক শব্দ আগে বা পরে বসিয়ে বহুবচন প্রকাশ করা হয়। যেমন– সাত সমুদ্র, তের নদী, মণ চারেক, ঘণ্টা তিনেক ইত্যাদি।

৮. কোনো কোনো সর্বনামকে পর পর দুইবার বসিয়ে বহুবচন প্রকাশ করা হয়। যেমন : কেউ কেউ হয়ত এ কাজটি করে থাকবে। কোন কোন সময় সে বেশি কথা বলে।

৯. বিশেষ্যপদকে পর পর দুইবার বসিয়ে বহুবচন প্রকাশ করা হয়। যেমন– অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার, ডালে ডালে আম ঝুলছে, বনে বনে পাখি গান গাইছে, দলে দলে লোক মাঠে জমায়েত হচ্ছে।

১০. জাতিবাচক শব্দের একবচনেই বহুবচনের অর্থ প্রকাশ পায়। যেমন: মাছ (সব মাছ) পানিতে থাকে, বনে হরিণ (সব হরিণ) বিচরণ করে।

১১. বিশেষণ পদ পর পর দুইবার ব্যবহার করে বহুবচন করা হয়। যেমন– বড় বড় লোকের কথা শুনে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি, শিশুদের নরম নরম খাবার দিতে হয়, বেশি বেশি কাজ করলে লোকের কদর মেলে।

১২. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য পদেও বহুবচনের অর্থ প্রকাশ পায়। যেমন– সেনাদল, সভা, লিচুর থোকা ইত্যাদি।

১৩. নিম্নলিখিত সমষ্টিবাচক শব বা শব্দাংশ একবচনের সঙ্গে যুক্ত করে বহুবচন প্রকাশ করা হয়। যেমন :

আবলি : অপ্রাণিবাচক শব্দে– পদাবলি, রচনাবলি, ব্রজাবলি ইত্যাদি।

উচ্চয় : প্রাণি ও অপ্রাণিবাচক শব্দে– শিলোচ্চয়, পুষ্পোচ্চয় ইত্যাদি।

কুল : প্রাণিবাচক শব্দে– জীবকুল, প্রাণিকুল, মনুষ্যকুল ইত্যাদি।

গণ : প্রাণিবাচক শব্দে– মানুষগণ, বন্ধুগণ ইত্যাদি।

গুচ্ছ : অপ্রাণিবাচক শব্দে– কেশগুচ্ছ, পুষ্পগুচ্ছ ইত্যাদি।

গ্রাম : অপ্রাণিবাচক শব্দে– গুণগ্রাম

চয় : প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– বন্ধুচয়, পুষ্পচয়।

জাল : অপ্রাণিবাচক শব্দে : বিপজ্জাল, শরজাল।

দল : প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– সৈন্যদল, কারাতদল, শ্রমিকদল।

দাম : অপ্রাণিবাচক বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন– শৈবালদাম, পুষ্পদাম।

নিকর : অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়। যেমন– কমলনিকর।

নিচয় : প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– বুধচয়, পুষ্পচয়।

পাল : প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– মৃগপাল, মেষপাল, ছাগপাল ইত্যাদি।

পুঞ্জ : প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– কবিপুঞ্জ, লেখকপুঞ্জ, মেঘপুঞ্জ ইত্যাদি।

বৃন্দ : প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– প্রজাবৃন্দ, লেখকবৃন্দ, কবিবৃন্দ ইত্যাদি।

ব্রজ : অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়। যেমন– ভূধরব্রজ।

ত্রাত : প্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়। যেমন– মধুকরত্রাত।

মণ্ডল : প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– সারস্বতমণ্ডল, বুধমণ্ডল।

মণ্ডলি : প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– শিক্ষকমণ্ডলি, নক্ষত্রমণ্ডলি।

মহল : প্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়। যেমন– মহিলামহল, গুণিমহল।

মালা : অপ্রাণিবাচক শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন– মেঘমালা, পর্বতমালা।

যুথ : প্রাণিবাচক শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন– গজযুথ, মৃগযুথ।

রাজি : অপ্রাণিবাচক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন– বৃক্ষরাজি, মেঘরাজি, পুষ্পরাজি।

রাশি : অপ্রাণিবাচক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন– পত্ররাশি, পুষ্পরাশি।

শ্রেণি : প্রাণিবাচক এবং অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন– দ্বিজশ্রেণি, পাদপশ্রেণি।

সংঘ : প্রাণিবাচক শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন– ব্রতিসঙ্ঘ, বিদ্বৎসংঘ।

সমূহ : প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন– পুস্তকসমূহ, জাতিসমূহ।

১৪. অনেক ক্ষেত্রেই প্রাণি ও অপ্রাণিভেদে ব্যতিক্রম দেখা যা, বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে এ প্রবণতা লক্ষণীয়। মধুসূধদনের কবিতায় এ ধরনের উদাহরণ পাওয়া যায়–

কে না জানে ফুলকুল বিরসবেদনা,
চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি ইত্যাদি।
চুম্মিতাম, মজুরিত যবে
দম্পতি মঞ্জরী বৃন্দে।

১৫. সমষ্টিবাচক শব্দের বিচ্ছিন্নতা প্রয়োগ, সম্বন্ধবাচক পদের সঙ্গে–

রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে। –মদন মোহন
ছিড়িয়া পড়িল খসি
অশ্রু মুকুতার রসি। –রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ। –রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬. শব্দদ্বৈত অনেক সময় বহুবচন বুঝায়। যেমন– বাড়ি বাড়ি আনন্দ, ঘরে ঘরে উৎসব।

১৭. বহুবচনের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য–

ক) বিশেষ্য শব্দের একবচনের ব্যবহারেও অনেক সময় বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন: সিংহ বনে থাকে (একবচন ও বহুবচন উভয়ই বোঝায়)। পোকা আক্রমণে ফসল নষ্ট হয় (বহুবচন)। হাটে লোক জমা হয়েছে (একবচন ও বহুবচন উভয়ই বোঝায়)।

খ) বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন : বহুবচন বিশেষ্য ও সর্বনাম– ছেলেরা কানাকানি করছে। এটাই আদিবাদের বাড়ি। নজরুলরা প্রতিদিন জন্মায় না। সবাই সব খবর রাখে না।

গ) কতিপয় বিদেশি শব্দে, সে ভাষায় অনুসরণে বহুবচন হয়। যেমন : আন যোগে– বুজুর্গ-বুজর্গান, সাহেব-সাহেবান ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. বচন ব্যাকরণের কিরূপ শব্দ?

ক) অব্যয়সূচক শব্দ
খ) প্রাতিপদিক শব্দ
গ) পারিভাষিক শব্দ
ঘ) কারকসূচক শব্দ

২. বচন কয় প্রকার?

ক) দুই
খ) তিন
গ) চার
ঘ) পাঁচ

৩. বাংলা ব্যাকরণে কোন বচন নেই?

ক) একবচন
খ) দ্বিবচন
গ) বহুবচন
ঘ) কোনটিই নয়।

৪. কোন দুটি পদের বচনভেদ হয়?

ক) বিশেষ্য ও সর্বনাম
খ) বিশেষ্য ও বিশেষণ
গ) সর্বনাম ও অব্যয়
ঘ) ক্রিয়া ও অব্যয়

৫. বচন অর্থ কী?

ক) গণনার ধারণা
খ) পরিমাণের ধারণা
গ) ক্রমের ধারণা
ঘ) সংখ্যার ধারণা

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বচন কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী আলোচনা করুন।
২. বহুবচন কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন।
৩. প্রাণিবাচক শব্দে যে সমষ্টিবাচক শব্দসমূহ যুক্ত হয়ে বহু বচন হয় এমন যে কোনো ৫টি শব্দ যোগে বাক্য রচনা করুন।
৪. বিশেষ নিয়মে বহুবচন গঠনের কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. ক ৩. খ ৪. ক ৫. ঘ

পাঠ-৩.৫ : পদাশ্রিত নির্দেশক

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- পদাশ্রিত নির্দেশকের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- বাংলা ভাষার পদাশ্রিত নির্দেশকগুলো কী কী তা লিখতে পারবেন।
- বাংলা ভাষার পদাশ্রিত নির্দেশকগুলো কী অর্থে ব্যবহৃত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভাষায় কিছু পদ আছে যেগুলো অন্য পদের নির্দিষ্টতা বুঝিয়ে থাকে। নির্দিষ্টতা জ্ঞাপনকারী এই পদগুলো সাধারণত নামপদের পরে বসে বা আশ্রয়ে থাকে। তাই বাংলা ব্যাকরণে এদেরকে পদাশ্রিত নির্দেশক বলা হয়ে থাকে। তবে এই নির্দেশক পদের ব্যবহারের কতিপয় নিয়মও রয়েছে। আবার বাংলা ভাষার শব্দগঠনের পদাশ্রিত নির্দেশকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পদাশ্রিত নির্দেশকগুলো ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দিষ্ট করে প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। এই পাঠে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত এসব পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংজ্ঞা

যে সব অব্যয় বা প্রত্যয় বিশেষ্য ও সর্বনাম পদকে নির্দেশ করার জন্য বিশেষ্য বা সর্বনামের সঙ্গে যুক্ত হয়, সেগুলোকে পদাশ্রিত নির্দেশক বলা হয়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> কোনো বিশেষ্য দ্বারা দ্যোতিত পদার্থের রূপ, প্রকৃতি অথবা তৎসম্বন্ধে বক্তার মনের ভাব প্রকাশ করার একটা বিশেষ উপায় বাঙ্গালা ভাষায় আছে। টা, টি, টুকু, টুক, খানা, খানী (খানি) জল প্রভৃতি কতগুলো শব্দ বা শব্দাংশ আছে যেগুলি বিশেষ্যের সহিত (অথবা বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত সংখ্যাবাচক বিশেষণের সহিত) সংযুক্ত হইয়া যায়। পদার্থ বা বস্তুর গুণ বা প্রকৃতি নির্দেশ করে। এই রূপ শব্দ বা শব্দাংশকে পদাশ্রিত বলা যাইতে পারে। (ভাষা প্রকাশ-বাঙ্গালা ব্যাকরণ)

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত পদাশ্রিত নির্দেশক : বাংলা ভাষার ব্যবহৃত পদাশ্রিত নির্দেশকের মধ্যে টি, টা, টো, টুকু, টুকুন, টু, টুক, খান, খানা, খানি, খানেক, খানিক, গাছ, গাছি, গাছা, গোটা, গুলি, গুলো, গুলান ইত্যাদি বহুল প্রচলিত।

বাংলা পদাশ্রিতনির্দেশকের ধরন

বাংলা ভাষায় বচনভেদে পদাশ্রিত নির্দেশক বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন–

ক. একবচন প্রকাশে : টি, টা, খানা, খানি, গাছা, গাছি ইত্যাদি। উদাহরণ– কলমটি, বইটা, বৈঠকখানা, ইত্যাদি।

খ. বহুবচন প্রকাশে : গুলি, গুলা, গুলো ইত্যাদি। উদাহরণ– আমগুলি, ফলগুলো, গরুগুলো, কুকুরগুলো, বিড়ালগুলা প্রভৃতি।

গ. কোনো সংখ্যা বা পরিমাপের স্বল্পতা প্রকাশে: টে, টুকু, টুকুন ইত্যাদি। উদাহরণ– তিনটে চাল, ভাতটুকু, পায়েস টুকুন, এতটুকুন মেয়ে প্রভৃতি।

ঘ. অনির্দেশক প্রত্যয়: টি, টা, এক, জন, খান ইত্যাদি দ্বারা নিদিষ্ট কাউকে বোঝায় না। তাই এসব প্রত্যয় অনির্দেশক প্রত্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। উদাহরণ– একটা গল্প বলি, চারটি ভাত দাও, জন চারেক লোক হলেই চলবে, এক যে ছিল রাণী, গোটা কয়েক সমস্যা ইত্যাদি।

৩. পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যবহার

ক) টি, টা-র ব্যবহার

১) এক শব্দের সঙ্গে টা, টি যুক্ত হলে অনির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন– একটি দোকান, লোকটা কী কাণ্ডই না করলো।

২) নির্দেশক সর্বনামের পরে টা, টি যুক্ত হলে তা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন– এটি যেন কার বাড়ি? ওটা নয়, ঐটা আন। এটিই আমার প্রিয় বই।

৩) নিরর্থক ভাবেও নির্দেশক টা, টি ব্যবহৃত হয়। যেমন– সারাটি দিন তোমার অপেক্ষায় আছি, ন্যাকামিটা এখন রাখ।

৪) বড় জিনিস সম্বন্ধে অবজ্ঞা, অপ্রিয়তা ইত্যাদি বোঝাতে টা ব্যবহৃত হয়। যেমন– ছাতাটা কোথায়?

৫) প্রাণিবাচক শব্দের পরে অনাদর বা ঔদাসীন্য বোঝাতে টা ব্যবহৃত হয়। যেমন– ছেলেটা কেমন! বেয়াদবটা গেল কোথায়?

৬) অতি ঘনিষ্ঠতা বোঝাতে টা ব্যবহৃত হয়। যেমন– আকিবটা বেশ চটপটে। মেয়েটা বেশ ভদ্র।

৭) কোনো বস্তুর আকারের পূর্ণতা বোঝাতে টা ব্যবহৃত হয়। যেমন– বাড়িটা হাহাকার করছে। কবিতা বেশ বড়।

খ) টু-এর ব্যবহার

১. অল্প অর্থে টু ব্যবহৃত হয়। যেমন– আমার ফিরতে একটু দেরি হবে। তার মন আগের চেয়ে ভালো।

২. আদর বোঝাতে টু ব্যবহৃত হয়। যেমন– একটু কাছে এস বাবা। একটু খেয়ে দুধ খাও।

গ) টুকু-এর ব্যবহার

সংস্কৃত 'তনুক' শব্দ থেকে 'টুকু' শব্দের উদ্ভব। মৈথিলী সাহিত্যে তনুক শব্দের ব্যবহার রয়েছে। এ শব্দটি এখনও হিন্দিতে ব্যবহৃত হয়। টুকু ব্যবহারের কয়েকটি নিয়ম–

১. অল্প বোঝাতে টুকু ব্যবহৃত হয়। যেমন– এতটুকু ছেলে, কিন্তু কথায় পাকা।

২. আদর বোঝাতে টুকু ব্যবহৃত হয়। যেমন– দুধটুকু খেয়ে নাও।

৩. অরূপ পদার্থবাচক বিশেষ্য পদে টুকু ব্যবহার করা হয়। যেমন– হাওয়াটুকু, কৌশলটুকু, ভারটুকু ইত্যাদি।

৪. যে জিনিসকে টুকরো করলে তার বিশেষেত্ব নষ্ট হয় না, সে সম্বন্ধে টুকু ব্যবহৃত হয়। যেমন– কাগজটুকু, বৈঠকটুকু ইত্যাদি।

ঘ) 'গাছা' ও 'গাছি'–র ব্যবহার

১. খানি, খানা যেমন মোটের ওপর চওড়া জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তেমনি সরু জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় গাছা। যেমন– লাঠিগাছা, ছড়িগাছা, সুতোগাছা, মালাগাছা, শিকলগাছা ইত্যাদি।

২. জীববাচক পদার্থ বোঝাতে গাছা ও গাছি ব্যবহৃত হয় না। যেমন– কেচোগাছি বলা যায় না।

৩. সরু জিনিস লম্বা ছোট হলে সেক্ষেত্রে গাছা ও গাছি ব্যবহৃত হয়। যেমন– দড়িগাছা হয়, কিন্তু গোঁফগাছা হয় না। চুলগাছি যখন বলা হয় তখন চুলের লম্বা দিককেই নির্দেশ করা হয়।

ঙ) খানেক– এর ব্যবহার

১. অনির্দেশক প্রত্যয়রূপে খানেক ব্যবহৃত হয়। যেমন– আমাকে শ খানেক টাকা দাও। চল, মাইল খানেক হেঁটে আসি।

২. স্বতন্ত্র শব্দের পরেও খানেক ব্যবহৃত হয়। যেমন– ঘণ্টা খানেক পরে দেখা করো।

চ) গোটা বচনবাচক শব্দের আগে বসে এবং খানা, খানি পরে বসে। এগুলো নির্দেশক ও অনির্দেশক উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। গোটা শব্দ আগে বসে এবং সংশ্লিষ্ট পদটি নির্দিষ্টতা না বুঝিয়ে অনির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন– গোটা বাড়িটাই খা খা করছে। গোটা পঞ্চাশ টাকা হলেই হয়। দুখানা কমলালেবু দাও। গোটা দশেক কাঁঠাল আন। একখানা চেয়ার নিয়ে এসো।

তবে অনেক সময় কবিতায় শৈলী প্রকাশে বিশেষ অর্থে খানি নির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন– 'আমি অভাগা এনেছি বহিয়া নয়ন জলে ব্যর্থ সাধনখানি।'

ছ) টাক, টুক, টুকু, টো ইত্যাদি পদাশ্রিত নির্দেশক নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– পোয়াটাক মধু দাও। সবটুকু ভাত খেয়ে ফেল।

জ) বিশেষ অর্থে, নির্দিষ্টতা জ্ঞাপনে কয়েকটি শব্দ : কেতা, তা, পাটি ইত্যাদি। যেমন–

১. কেতা : এ তিন কেতা জমির দাম মাত্র এক লক্ষ টাকা। বিশ টাকার দশ কাতা নোট।
২. তা : ছয় তা কাগজ দাও।
৩. পাটি : তার উপরের পাটি দাঁত নেই।

ঝ) ইংরেজিতে This, my প্রভৃতি সর্বনাম বিশেষণ পদ থাকলে বিশেষ্যের পূর্বে article বসে না। কিন্তু বাংলায় এক্ষেত্রে টি বসে। যেমন– আমার বইটি কোথায়? তোমার কলমটি কোথায় রাখলে?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন

১. যে প্রত্যয় নির্দিষ্টতা বোঝায় তাকে কী বলে?
ক) সংখ্যা খ) লিঙ্গ
গ) পদাশ্রিত নির্দেশক ঘ) অনুসর্গ

২. কোনটি ভেদে পদাশ্রিত নির্দেশক বিভিন্নতর হয়?
ক) কালভেদে খ) বচনভেদে
গ) পুরুষভেদে ঘ) পদভেদে

৩. বিশেষ অর্থে নির্দিষ্টতা বোঝায় কোনটি?
ক) টি খ) টুকু
গ) পাটি ঘ) খানা

৪. নির্দেশক সর্বনামের সাথে টা, টি যুক্ত হলে তা কী হয়?
ক) উৎকৃষ্ট খ) নিকৃষ্ট
গ) সুনির্দিষ্ট ঘ) অস্পষ্ট

৫. নির্দিষ্টতা বোঝাতে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে কোনটি যুক্ত হয়?
ক) এক খ) টুকু
গ) গোটা ঘ) টি

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পদাশ্রিত নির্দেশক বলতে কী বোঝেন? উদাহরণসহ লিখুন।
২. টা, টি, খানা, খানি, গাছা, এই পদাশ্রিত নির্দেশকগুলোর প্রয়োগ দেখিয়ে বাক্য রচনা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. খ ৩. গ ৪. গ ৫. ঘ

পাঠ-৩.৬ : সমাস

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- সমাসের সংজ্ঞা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সমাসের কয়েকটি পরিভাষা লিখতে পারবেন।
- সমাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলা ভাষায় দুই বা ততোধিক পদকে একপদে পরিণত করার অন্যতম উপায় হচ্ছে সমাস। সমাসের মাধ্যমে বাংলায় নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়। কারণ দুই বা ততোধিক পদের এক সাথে মিলিত হয়ে যে ভিন্ন আরেকটি পদ তৈরি হয়, সেটি নতুন শব্দ হিসেবেও ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। এছাড়া সমাস একটি কৌশল যার মাধ্যমে বহু শব্দকে সংক্ষেপিত রূপে বাক্যে ব্যবহার করা যায়। এই সমাসীকরণের রীতি সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে। তবে কিছু খাঁটি বাংলা সমাসের অস্তিত্বও বাংলা ব্যাকরণে লক্ষণীয়। এই ইউনিটে সমাসের সার্বিক ব্যাকরণগত ও ব্যবহারিক রূপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংজ্ঞা

পরস্পর অর্থ সঙ্গতিবিশিষ্ট দুই বা বহুপদের একপদে পরিণত হওয়াকে বলা হয় সমাস।

মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' (২০১৫) গ্রন্থে সমাসের সংজ্ঞায় বলেছেন– 'সমাস মানে সংক্ষেপ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। অর্থসম্বন্ধ আছে এমন একাধিক পদের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে'।

সমাসের কয়েকটি পরিভাষা

ক. সমস্যমান পদঃ যে যে পদে সমাস হয় তাদের প্রত্যেককে সমস্যমান পদ বলে। যেমন– সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন। এ বাক্যে সিংহ, চিহ্নিত, আসন– এ তিনটি হচ্ছে সমস্যমান পদ।

খ. সমস্ত পদ : সমস্যমান পদগুলো মিলিত হয়ে যে একপদে পরিণত হয়, তাকে সমস্ত পদ বলে। একে আবার সমাসবদ্ধ পদও বলা হয়। যেমন– সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন। এখানে সিংহাসন হচ্ছে সমস্ত পদ।

গ. ব্যাসবাক্য : সমাসবদ্ধ পদটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য যে বাক্য তৈরি করা হয় তাকে ব্যাসবাক্য বলে। 'ব্যাস' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ। একে ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্যও বলা হয়। উপরের বাক্যে 'সিংহ চিহ্নিত আসন' হলো সিংহাসন শব্দের ব্যাসবাক্য।

ঘ. পূর্বপদ ও পরপদ : সমাস যুক্ত পদের প্রথম অংশকে বলা হয় পূর্বপদ এবং শেষ অংশকে বলা হয় পরপদ বা উত্তরপদ। সিংহাসন শব্দের সিংহ হলো পূর্বপদ, আর আসন হলো পরপদ বা উত্তরপদ।

সমাসের প্রয়োজনীয়তা

বাংলা ব্যাকরণে রূপতত্ত্ব অংশে সমাস আলোচিত হয়েছে। শব্দগঠনের তিনটি প্রক্রিয়া সংযোজন, বিয়োজন ও অর্থপরিবর্তন– এ তিনটির মধ্যে সমাস হলো সংযোজন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষেপণ, মিলন ও একাধিক পদের একপদীকরণ। সমাস শব্দের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য হলো একত্রে অবস্থান বা সংক্ষেপণ। সুতরাং ভাষায় সমাসের প্রধান কাজ হলো শব্দ ও বাক্য সংক্ষিপ্তকরণ। সমাস ভাষাকে শ্রুতিমধুর করে। ভাষার অলঙ্করণ, গুণ সংযোজন ও পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে সমাসের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। তাই বলা যায়, বাংলাভাষাকে সংক্ষিপ্ত, শ্রুতিমধুর ও সাবলীল করার জন্য সমাসের ভূমিকা অপরিসীম।

সমাসের মাধ্যমেই বাক্য ও ভাষা সহজ, সরল, সুন্দর ও শ্রুতিমধুর হয়। যেমন– বিলাত থেকে ফেরত= বিলাতফেরত। এ বাক্যের শব্দগুলো সংক্ষিপ্ত হয়ে সমাসবদ্ধ পদ হিসেবে 'বিলাতফেরত'-এ হওয়ায় যেমন সংক্ষিপ্ত হয়েছে, তেমনি হয়েছে সাবলীল ও শ্রুতিমধুর। অতএব সমাস বাক্যকে সংক্ষিপ্ত, সুন্দর ও শ্রুতিমধুর করে। এছাড়া অলঙ্করণ ও শব্দগঠনের ক্ষেত্রেও সমাসের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। নতুন শব্দ গঠনে সমাস কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. অর্থসঙ্গতিবিশিষ্ট একাধিক পদের একপদে পরিণত হওয়াকে কী বলে?

ক) সমাস　　খ) কারক
গ) বচন　　ঘ) বাচ্য

২. সমাস শব্দের অর্থ কী?

ক) বিশ্লেষণ　　খ) সংক্ষেপণ
গ) সংযোজন　　ঘ) সংশ্লেষণ

৩. সমাসের রীতি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে?

ক) আরবি　　খ) ফারসি
গ) সংস্কৃত　　ঘ) ইংরেজি

৪. যে যে পদে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটির নাম কী?

ক) সমস্যমান পদ　　খ) ব্যাসবাক্য
গ) সমাসবাক্য　　ঘ) সমস্তপদ

৫. সমাস নিষ্পন্ন পদটির নাম কী?

ক) ব্যাসবাক্য　　খ) বিগ্রহবাক্য
গ) সমস্যমান পদ　　ঘ) সমস্ত পদ

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক　২. খ　৩. গ　৪. ক　৫. ঘ

পাঠ-৩.৬.২ : সমাসের প্রকারভেদ– দ্বন্দ্ব, কর্মধারয় ওতৎপুরুষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- সমাসের প্রকারভেদ বলতে পারবেন।
- দ্বন্দ্ব, কর্মধারয় ও তৎপুরুষ সমাস বর্ণনা করতে পারবেন।

সমাসের প্রকারভেদ

বাংলা ব্যাকরণে সমাস ছয় প্রকার; যথা–
দ্বন্দ্ব সমাস, কর্মধারয় সমাস, তৎপুরুষ সমাস, দ্বিগু সমাস, অব্যয়ীভাব সমাস এবং বহুব্রীহি সমাস।

দ্বন্দ্ব সমাস

সংজ্ঞা : যে সমাসে সমস্যমান প্রত্যেক পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে তাকে বলা হয় দ্বন্দ্ব সমাস। যেমন–
ছেলে ও মেয়ে = ছেলেমেয়ে, স্বর্গ ও নরক = স্বর্গ-নরক ইত্যাদি

দ্বন্দ্ব মানে জোড়া। এ সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য ব্যাসবাক্যে ও, এবং, আর– এ তিনটি অব্যয়পদ সংযোজক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ক. প্রকারভেদ

দ্বন্দ্ব সমাসকে নিম্নোক্ত কয়েক প্রকার হতে পারে–

১. **মিলনার্থক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে দুটি পদের পরস্পর মিলন ঘটে এবং এদের অর্থের দিক থেকেও মিল থাকে সে দ্বন্দ্ব সমাসকে বলা হয় মিলনার্থক দ্বন্দ্ব। যেমন– ভাই-বোন, মা-বাপ, মাসি-পিসি, চা-বিস্কুট, লতা-পাতা, মাছ-ভাত, পিতা-পুত্র ইত্যাদি।

২. **বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব :** অর্থের দিক থেকে যে দ্বন্দ্ব পরস্পরের মধ্যে বিরোধ তৈরি করে তাকে বলা হয় বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব। যেমন– ভালোমন্দ, সাদাকালো, দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক, দেবদানব, ধনীগরিব ইত্যাদি।

৩. **বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে পরপদটি পূর্বপদের বিরোধী ভাব বা অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন– ভালোমন্দ, দিনরাত, টকমিষ্টি, দেশেবিদেশে, ছেলেবুড়ো, আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, লাভ–লোকসান ইত্যাদি।

৪. **অঙ্গবাচক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসের সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে নির্দেশ করা হয় তাকে বলা হয় অঙ্গবাচক দ্বন্দ্বসমাস। যেমন– নাক-মুখ, মাথা-মুণ্ড, বুক-পিঠ, নাক-কান, হাত-পা ইত্যাদি।

৫. **বহুপদবিশিষ্ট দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে দুই বা ততোধিক পদ মিলে দ্বন্দ্ব সমাস হয় তাকে বলা হয় বহুপদবিশিষ্ট দ্বন্দ্ব সমাস। যেমন– কায়, মনো এবং বাক্যে= কায়মনোবাক্যে, সাহেব, গোলাম এবং বিবি = সাহেব-গোলাম-বিবি, আমি, তুমি এবং সে = আমরা, স্বর্গ, মর্ত এবং পাতাল = স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ইত্যাদি।

৬. **সংখ্যাবাচক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ উভয় দ্বারা সংখ্যা বোঝায় তাকে বলা হয় সংখ্যাবাচক দ্বন্দ্ব। যেমন– সাত-পাঁচ, ছয়-নয়, নয়-ছয়, ঊনিশ-বিশ. সাত-সতের, লক্ষ– কোটি, দশ-বারো ইত্যাদি।

৭. **সমার্থক দ্বন্দ্ব :** একই জাতীয় বস্তুর সাহায্যে যে দ্বন্দ্ব বা মিলনবাচক সমাস হয় অর্থাৎ যে দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপর একই অর্থ বহন করে, তাকে সমার্থক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন– ঘরদুয়ার, ঘরবাড়ি, কলকারখানা, বইপুস্তক, গাছগাছালি, শাকসবজি, কাগজপত্র, চিঠিপত্র, হাটবাজার ইত্যাদি।

৮. **একশেষ দ্বন্দ্ব :** যে সমাসে অন্যান্য পদের বিলুপ্তি ঘটিয়ে প্রধান পদটির সঙ্গে শেষপদটির সামঞ্জস্য রচিত হলে তাকে বলা হয় একশেষ দ্বন্দ্ব। যেমন– জায়া ও পতি = দম্পতি, তুমি ও সে = তোমরা ইত্যাদি।

৯. **অলুক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তির লোপ হয় না তাকে বলা হয় অলুক দ্বন্দ্ব। যেমন– দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে, মায়ে-ঝিয়ে, ঘরে-বাইরে, আগে-পরে, ধনেজনে, বনে-জঙ্গলে, বুকেপিঠে, হাতেকলমে ইত্যাদি।

দ্বিগু সমাস

সংখ্যাবাচকশব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাসহয়, তাকেবলাহয় দিগু সমাস। উদাহরণ–
চারপদেরসমাহার= চুতুষ্পদ, চার অঙ্কের সমাহার= চতুরঙ্গ, ত্রি (তিন) ফলেরসমাহার= ত্রিফলা, ত্রি (তিন) প্রান্তরেরসমাহার= তেপান্তর, ত্রি (তিন) রত্নেরসমাহার = ত্রিরত্ন, ত্রি (তিন) ভুজেরসমাহার = ত্রিভুজ,ত্রি (তিন) জগতেরসমাহার= ত্রিজগৎ, ত্রি (তিন) মাথারসমাহার = তেমাথা, ত্রি (তিন) পায়েরসমাহার = তেপায়া, নব (নয়) রত্নেরসমাহার = নবরত্ন, পাঁচ সেরেরসমাহার= পশুরী, পঞ্চনদেরসমাহার= পঞ্চনদ। সে (তিন) তারেরসমাহার= সেতার, সপ্তঅহেরসমাহার= সপ্তাহপ্রভৃতি।

কর্মধারয় সমাস

সংজ্ঞা : কর্মধারয় শব্দটির ব্যুৎপত্তি হলো– কর্ম + ধৃ+ ণিচ + আ = কর্মধারয়। এতে সমান বিভক্তিযুক্ত বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের মিলন হয় এবং পরপদে বিশেষ্যের অর্থ প্রধান থাকে। অর্থাৎ যে সমাসে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় তাকে বলা হয় কর্মধারয় সমাস। যেমন– নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম, যে শান্ত সেই শিষ্ট = শান্তশিষ্ট, যা কাঁচা তাই পাকা= কাঁচাপাকা ইত্যাদি।

প্রকারভেদ

কর্মধারয় সমাসে নিম্নোক্ত কয়েকভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১. **মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস :** যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ পায় তাকে বলা হয় মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস। যেমন– পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন, সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, প্রীতিসূচক উপহার = প্রীতিউপহার, মৌ আশ্রিত মাছি = মৌমাছি, সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা, ঘরে আশ্রিত জামাই =ঘরজামাই, সাম্য বিষয়ক বাদ = সাম্যবাদ, স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি।

২. **উপমান কর্মধারয় সমাস :** যার সাথে তুলনা করা হয় তাকে বলা হয় উপমান কর্মধারয় সমাস। উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয়, আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাকে বলা হয় উপমান। উপমান ও উপমেয়ের একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে। যেমন– ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ = ভ্রমরকৃষ্ণকেশ। এখানে ভ্রমর উপমান এবং কেশ উপমেয়। কৃষ্ণত্ব হলো সাধারণ ধর্ম। সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন– তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশ্রভ্র, অরুণের ন্যায় রাঙা= অরুণরাঙা প্রভৃতি। উপমান কর্মধারয় সমাসের আরও কয়েকটি উদাহরণ– নিমতিতা, মিশকালো, বিড়ালতপস্বী, বজ্রকঠোর, ইস্পাতকঠিন, শশব্যস্ত, তুষারশীতল, কুসুমকোমল ইত্যাদি।

৩. **উপমিত কর্মধারয় সমাস :** প্রত্যক্ষ বস্তুর সাথে পরোক্ষ বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয় বা উপমিত। যেমন– মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র, পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ, চরণ কোমলের ন্যায় = চরণকোমল, অধর কোমলের ন্যায় = অধরকোমল, ফুল বাবুর ন্যায় = ফুলবাবু, ফুল কুমারীর ন্যায় = ফুলকুমারী, কর কমল সদৃশ =করকমল, পদ পল্লবের ন্যায় = পদপল্লব ইত্যাদি।

৪. **রূপক কর্মধারয় সমাস :** উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে তাকে বলা হয় রূপক কর্মধারয় সমাস। এ সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে এবং উপমান পদ পরে বসে এবং সমস্যমান পদে 'রূপ' অথবা 'ই' যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন করা হয়। যেমন– মন রূপ মাঝি= মনমাঝি, বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু, ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল, মন রূপ বাউল = মনবাউল, দিল রূপ দরিয়া= দিলদরিয়া, নীল রূপ দরিয়া = নীলদরিয়া, স্নেহ রূপ সুধা = স্নেহসুধা, প্রাণ রূপ পাখি= প্রাণপাখি, জীবন রূপ স্রোত = জীবনস্রোত, ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল, জীবন রূপ তরী = জীবনতরী, সংসার রূপ সাগর = সংসারসাগর, শোক রূপ অনল = শোকানল, ভব রূপ নদী = ভবনদী, ক্ষুধা রূপ অনল = ক্ষুধানল, শোক রূপ সিন্ধু= শোকসিন্ধু, সমর রূপ অনল = সমরানল ইত্যাদি।

তৎপুরুষ সমাস

সংজ্ঞা : তৎপুরুষ শব্দটির ব্যুৎপত্তি হলো তন+ অদ= তৎ, অর্থাৎ সে বা তিনি। আর পৃ+ উষ = পুরুষ। এক্ষেত্রে এর শাব্দিক অর্থ 'তার সম্পর্কীয় পুরুষ'। এতে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত দুটি পদ থাকে। দুটি পদই বিশেষ্য হতে পারে। এর মধ্যে প্রথমটি দ্বিতীয়টির অর্থকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। প্রথমটির অব্যয় পরবর্তীটির সাথে কর্মরূপে, করণরূপে, সম্প্রদানরূপে, অপাদানরূপে, সম্বন্ধরূপে অথবা অধিকরণরূপে ঘটে। দ্বিতীয় পদটির অর্থ প্রধান অর্থ হয়ে থাকে। তৎপুরুষ সমাসের সংজ্ঞায় বলা হয় 'পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পেয়ে এবং পরপদের অর্থ প্রধানরূপে যে সমাস গঠিত হয়, তাকে বলা হয় তৎপুরুষ সমাস।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, 'যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় এবং উত্তরপদের অর্থ প্রধানরূপে বুঝায়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।'

তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত যে কোনো বিভক্তি থাকতে পারে আর পূর্বপদের বিভক্তি হিসেবে এদের নামকরণ হয়। যেমন– বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন, এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি কে লোপ পেয়েছে বলে এর নাম হয়েছে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস।

প্রকারভেদ

তৎপুরুষ সমাস গঠনে বিভক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভক্তির ভিত্তিতে তৎপুরুষ সমাসকে নিম্নোক্ত নয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস, তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস, চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস, পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস, ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস, সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস, নঞ তৎপুরুষ সমাস, উপপদ তৎপুরুষ সমাস এবং অলুক তৎপুরুষ সমাস। নিচে উদাহরণসহ এসব তৎপুরুষ সমাস আলোচনা করা হলো।

১. **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে) লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাকে বলা হয় দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস। যথা–
দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন, পরলোকে গত = পরলোকগত, লোককে অতীত = লোকাতীত, স্বর্গকে প্রাপ্ত = স্বর্গপ্রাপ্ত, ধর্মকে সংক্রান্ত = ধর্মসংক্রান্ত, অশ্বকে আরুঢ় = অশ্বারুঢ়, সংখ্যাকে অতীত = সংখ্যাতীত, বিস্ময়কে আপন্ন= বিস্ময়াপন্ন, স্মরণকে অতীত = স্মরণাতীত, গৃহকে প্রবিষ্ট = গৃহপ্রবিষ্ট, ক্ষমতাকে প্রাপ্ত = ক্ষমতাপ্রাপ্ত, শরণকে গত = শরণাগত, দেশকে আশ্রিত = দেশাশ্রিত, ভারকে প্রাপ্ত = ভারপ্রাপ্ত ইত্যাদি। এছাড়া যথা, তথা, রূপে, ভাবে ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়ে থাকে। যেমন– আধ রূপে পাকা= আধপাকা, নিমভাবে রাজি= নিমরাজি, ধীর যথা তথা গামী = ধীরগামী, অর্ধরূপে মৃত = অর্ধমৃত, অবশ্য যথা তথা কর্তব্য =অবশ্যকর্তব্য ইত্যাদি।
আবার ব্যাপ্তি অর্থে কালবাচক পদের সাথে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন–
অর্ধরূপে স্ফুট = অর্ধস্ফুট, চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী, চিরকাল ব্যাপী স্মরণীয় = চিরস্মরণীয়, চিরকাল ব্যাপিয়া কুমারী = চিরকুমারী, চিরকাল ব্যাপী স্থায়ী = চিরস্থায়ী, ক্ষণকাল ব্যাপীয়া স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী প্রভৃতি।

২. **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস :** যে সমাসে পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, তে ইত্যাদি) লোপ পায়, তাকে বলা হয় তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস। যেমন– মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা, শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ, বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত = বস্ত্রাচ্ছাদিত, লাঠি দ্বারা খেলা = লাঠিখেলা, রক্ত দ্বারা সিক্ত = রক্তসিক্ত, স্নেহ দ্বারা অন্ধ = স্নেহান্ধ, ধামা দ্বারা চাপা = ধামাচাপা, অস্ত্র দ্বারা উপচার = অস্ত্রোপাচার, জরা দ্বারা জীর্ণ = জরাজীর্ণ, স্বনাম দ্বারা ধন্য = স্বনামধন্য, ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য = ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, দৃষ্টি দ্বারা হীন = দৃষ্টিহীন, বিনয় দ্বারা অবনত = বিনয়াবনত, বাগ দ্বারা দত্তা = বাগদত্তা, মন দ্বারা গড়া = মনগড়া, শোক দ্বারা আর্ত = শোকার্ত, গুণ দ্বারা মুগ্ধ = গুণমুগ্ধ, তৈল দ্বারা আক্ত = তৈলাক্ত, শোক দ্বারা আকুল = শোকাকুল, মধুতে মাখা = মধুমাখা, বিপদ দ্বারা সঙ্কুল = বিপদসঙ্কুল প্রভৃতি।

৩. **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, রে, জন্য, তরে, নিমিত্ত) লোপের মাধ্যমে যে সমাস হয়, তাকে বলা হয় চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস। যেমন– গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি, আরামের জন্য কেদারা = আরামকেদারা, বসতের জন্য বাড়ি = বসতবাড়ি, বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা, হজ্বের জন্য যাত্রা = হজ্বযাত্রা, পাগলের নিমিত্তে গারদ = পাগলাগারদ, মরণের নিমিত্তে কাঠি = মরণকাঠি, শিশুর জন্য সাহিত্য = শিশুসাহিত্য, শয়নের নিমিত্তে কক্ষ = শয়নকক্ষ, রান্নার জন্য ঘর = রান্নাঘর, ছাত্রের জন্য আবাস = ছাত্রাবাস, ছাত্রীর জন্য নিবাস = ছাত্রীনিবাস, জীবনের নিমিত্তে কাঠি = জীবনকাঠি, ডাকের জন্য মাশুল = ডাকমাশুল প্রভৃতি।

৪. **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস :** যে সমাসে পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তির (হইতে, থেকে, চেয়ে) লোপ পায় তাকে বলা হয় পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস। সাধারণত পুত, জাত, আগত, ভীত, গৃহীত, নিয়ত, মুক্ত, উত্তীর্ণ, চালানো, ভ্রষ্ট ইত্যাদি পরস্পরের ফলে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন– বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত, প্রাণের চেয়ে অধিক = প্রাণাধিক, সত্য থেকে ভ্রষ্ট = সত্যভ্রষ্ট, প্রাণের চেয়ে প্রিয় = প্রাণপ্রিয়, জেল থেকে মুক্ত= জেলমুক্ত, জেল থেকে খালাস = জেলখালাস, পণ হতে মুক্তি = পণমুক্তি, আগা থেকে গোড়া = আগাগোড়া, পদ থেকে চ্যুত = পদচ্যুত প্রভৃতি।
কোনো কোনো সময় পঞ্চমী তৎপুরুষের ব্যাসবাক্য এর, চেয়ে ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার হয়। যেমন– প্রাণের চেয়ে প্রিয় = প্রাণপ্রিয়, পরাণের চেয়ে প্রিয় = পরাণপ্রিয় ইত্যাদি।

৫. **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস :** যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির (র, এর) লোপ পায় তাকে বলা হয় ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলা হয়। যেমন– চায়ের বাগান = চাবাগান, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, খেয়ার ঘাট= খেয়াঘাট, ছাত্রের সমাজ = ছাত্রসমাজ, দেশের সেবা = দেশসেবা, দিল্লীর ঈশ্বর = দিল্লীশ্বর, পাটের ক্ষেত = পাটক্ষেত, ছবির ঘর = ছবিঘর, বিড়ালের ছানা = বিড়ালছানা প্রভৃতি। ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের কতিপয় নিয়ম-

ক) ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে রাজা স্থলে রাজ, পিতা, মাতা, ভ্রাতা স্থলে যথাক্রমে পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ হয়। যেমন– দিল্লীর রাজা = দিল্লীরাজ, গজনীর রাজা= গজনীরাজ, রাজার পুত্র= রাজপুত্র, পিতার ধন = পিতৃধন, মাতার সেবা = মাতৃসেবা, ভ্রাতার পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি।

খ) পরপদে সহ,তুল্য, খায়, প্রতিম, এ সমস্ত শব্দ থাকলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন– পত্নীর সহ= পত্নীসহ বা সপত্নীক, কন্যার সহ = কন্যাসহ, সহোদরের প্রতিম= সহোদরপ্রতিম ইত্যাদি।

গ) কালের কোনো কোনো অংশবোধক শব্দ পরে থাকলে তা পূর্বে বসে। যেমন– অহ্নের (দিনের) পূর্বভাগ = পূর্বাহ্ন। পরপদে রাজি, গ্রাম, বৃন্দ, গণ, সূর্য ইত্যাদি সমষ্টিবাচক শব্দ থাকলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন– ছাত্রের বৃন্দ = ছাত্রবৃন্দ, গুণের গ্রাম = গুণগ্রাম, হস্তির যূথ = হস্তিযূথ ইত্যাদি।

ঘ) অর্ধ শব্দ পরপদ হলে সমস্ত পদে তা পূর্বপদ হয়। যেমন– পথের অর্ধ = অর্ধপথ ইত্যাদি।

ঙ) শিশু, দুগ্ধ ইত্যাদি শব্দ পরে থাকলে স্ত্রীবাচক পূর্বপদ পুরুষবাচক হয়। যেমন– মৃগীর শিশু = মৃগশিশু, ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ ইত্যাদি।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের আরও কয়েকটি উদাহরণ–

ফুলের গাছ = ফুলগাছ, খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট, চায়ের বাগান = চাবাগান, চায়ের দোকান = চাদোকান, সূর্যের আলোক = সূর্যালোক, পিতার তুল্য = পিতৃতুল্য, জাতিদের সংঘ = জাতিসংঘ, যমের আলয় = যমালয়, নাটকের অভিনয় = নাটকাভিনয়, মনের রথ = মনোরথ, দীনের বন্ধু = দীনবন্ধু, বাদরের নাচ = বাদরনাচ, বিড়ালের ছানা = বিড়ালছানা, নদীর জল = নদীজল, শিক্ষার মন্দির = শিক্ষামন্দির, দূতের আবাস = দূতাবাস, ভাইয়ের পো = ভাইপো, ঠাকুরের বাড়ি = ঠাকুরবাড়ি, কবিদের গুরু = কবিগুরু প্রভৃতি।

৬. **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস :** যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য় , তে) লোপ পায়, তাকে বলা হয় সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস। যেমন– গাছে পাকা = গাছপাকা, অকালে মৃত্যু = অকালমৃত্যু, দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা, ভোজনে পটু = ভোজনপটু, পূর্বে অদৃষ্ট = অদৃষ্টপূর্ব, দানে বীর = দানবীর, বস্তাতে পচা = বস্তাপচা, বনে বাস = বনবাস, পাপে আসক্ত = পাপাসক্ত, বাক্সতে বন্দী = বাক্সবন্দী, তালে কানা = তালকানা, নামাযে রত = নামাযরত, গোলায় ভরা = গোলাভরা, পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব, বাকে পটু = বাকপটু, মনে মরা = মনমরা, অকালে পক্ব= অকালপক্ব, পূর্বে শ্রুত = আশ্রুতপূর্ব ইত্যাদি।

৭. **নঞ তৎপুরুষ সমাস :** নাবাচক নঞ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন– নয় সুখ = অসুখ, নয় উচিত = অনুচিত, নেই বিশ্বাস = অবিশ্বাস, নেই মিল = অমিল, ন কাতর = অকাতর, নয় অতি দীর্ঘ = নাতিদীর্ঘ, নয় সত্যি = অসত্যি, নয় সত্য = অসত্য, নেই ভুল = নির্ভুল, নাই হায়া = বেহায়া, নয় = অচল, নাই বৃষ্টি = অনাবৃষ্টি, ন আচার = অনাচার, নয় অতি খর্ব = নাতিখর্ব, নয় হাজির = গরহাজির প্রভৃতি।

এছাড়া সংস্কৃত নঞ অব্যয়ের বাংলা প্রতিরূপ রূপে অ, অন, আনা, গর, বে, বি, ন, না, নি ইত্যাদি এসেছে। যেমন– নাই আহার = অনাহার, নয় জোড় = বিজোড়, নয় অতি দূর = নাতিদূর, নয় হাজির = গরহাজির, নাই সীমা = অসীম, নাই খুঁত = নিখুঁত, নয় বালক = নাবালক, নয় সৃষ্টি = অনাসৃষ্টি ইত্যাদি।

৮. উপপদ তৎপুরুষ সমাস : কৃৎ প্রত্যয় সাধিত পদকে বলা হয় কৃদন্ত পদ। কৃদন্ত পদের পূর্বের পদকে বলা হয় উপপদ। উপপদের সাথে কৃদন্ত পদের যে সমাস হয়, তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলা হয়। যেমন– পঙ্কে জন্মে যে = পঙ্কজ, যাদু করে যে = যাদুকর, ইন্দ্রকে জয় করেছে যে = ইন্দ্রজিৎ, ছেলে ধরে যে = ছেলেধরা, পকেট মারে যে = পকেটমার, স্থলে চলে যে = স্থলচর, চিত্র আঁকে যে = চিত্রকর, মানুষ খায় যে = মানুষখেকো, জল দেয় যে = জলদ, সত্য কথা বলে যে = সত্যবাদী, জলে চরে যে =জলচর, মধু পান করে = মধুপ, মদ পান করে যে = মদ্যপ ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে বর্ণচোরা, গলাকাটা, পা-চাটা, পাড়াবেড়ানী, ছা-পোষা, হাড়ভাঙা, ঘরপোড়া, মাছিমারা ইত্যাদি।

৯. অলুক তৎপুরুষ সমাস : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে বিভক্তি লোপ পায় না, তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলা হয়। যেমন– ঘানি তেল = ঘানিরতেল, ঘি দিয়ে ভাজা = ঘিয়েভাজা, গোড়ায় গলদ = গোড়ায়গলদ, তেলে ভাজা = তেলেভাজা, হাতে কাটা = হাতেকাটা, কল দ্বারা ছাঁটা = কলেছাঁটা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. 'আমরা' কোন সমাসের উদাহরণ?

ক) মিলনার্থক দ্বন্দ্ব　　খ) বহুপদী দ্বন্দ্ব
গ) বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব　　ঘ) সমার্থক দ্বন্দ্ব

২. যে সমাসে অন্যান্য পদের বিলুপ্তি ঘটিয়ে প্রধান পদটির সঙ্গে শেষ পদটির সামঞ্জস্য বুঝায় তাকে কোন সমাস বলে?

ক) বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব　　খ) অলুক দ্বন্দ্ব
গ) একশেষ দ্বন্দ্ব　　ঘ) বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব

৩. 'মৌমাছি' কোন সমাসের উদাহরণ?

ক) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়　　খ) উপমান কর্মধারয়
গ) উপমিত কর্মধারয়　　ঘ) রূপক কর্মধারয়

৪. 'শিশুসাহিত্য'এর ব্যাসবাক্য কী?

ক) শিশু ও সাহিত্য　　খ) শিশু দিয়ে সাহিত্য
গ) শিশুর জন্য সাহিত্য　　ঘ) শিশু কালের সাহিত্য

৫. 'চা বাগান' কোন সমাসের উদাহরণ?

ক) চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস　　খ) পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস
গ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস　　ঘ) সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ　২. ক　৩. ক　৪. গ　৫. গ

পাঠ-৩.৬.২ : সমাসের প্রকারভেদ– অব্যয়ীভাব, বহুব্রীহি ও দ্বিগু

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- অব্যয়ীভাব, বহুব্রীহি ও দ্বিগু সমাসের সংজ্ঞা বলতে পারেন।
- উক্ত সমাসের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

অব্যয়ীভাব সমাস

সংজ্ঞা : যে সমাসের পূর্বপদে অব্যয় থাকে এবং অব্যয়ের অর্থ প্রধানরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বলা হয় অব্যয়ীভাব সমাস। অন্যভাবে বলা যায়, পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে অর্থের প্রাধান্য থাকলে, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসের ব্যাসবাক্যে অব্যয় উল্লেখ হয় না, কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি গঠিত হয়। যেমন– জানু পর্যন্ত লম্বিত = আজানুলম্বিত (কাছে), মরণ পর্যন্ত = আমরণ ইত্যাদি।

বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ নিচে দেয়া হলো-

সামীপ্য (উপ) : কূলের সমীপে = উপকূল, নগরীর সমীপে = উপনগরী, শহরের সমীপে = উপশহর, কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ, অক্ষির সমীপে =সমক্ষ, ক্ষুদ্র মহাদেশ =উপমহাদেশ ইত্যাদি।

বীপ্সা (অনু, প্রতি): রোজ রোজ = হররোজ, ক্ষণ ক্ষণ = অনুক্ষণ, বছর বছর = ফিবছর, দিন দিন = প্রতিদিন, ক্ষণ ক্ষণ = প্রতিক্ষণ, হপ্তা হপ্তা = ফিহপ্তা ইত্যাদি।

অভাব (নিঃ, নির): ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ, মিলের অভাব = গরমিল, ভাবনার অভাব = নির্ভাবনা, জয়ের অভাব পরাজয়, জলের অভাব = নির্জল, আমিষের অভাব = নিরামিষ, উৎসাহের অভাব = নিরুৎসাহ, জীবন পর্যন্ত = আজীবন ইত্যাদি।

পর্যন্ত (আ) : কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ, পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক, জীবন পর্যন্ত = আজীবন ইত্যাদি।

সাদৃশ্য (উপ) : বনের সদৃশ =উপবন, শহরের সদৃশ = উপশহর, গ্রামের সদৃশ = উপগ্রাম, গ্রহের সদৃশ = উপগ্রহ, দ্বীপের সদৃশ = উপদ্বীপ, নদীর সদৃশ = উপনদী, ভাষার সদৃশ = উপভাষা ইত্যাদি।

অনতিক্রমতা (যথা): সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য, শক্তিকে অতিক্রম না করে = যথাশক্তি, শাস্ত্রকে অতিক্রম না করে = যথাশাস্ত্র, রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি, ইচ্ছাকে অতিক্রম না করে = যথাইচ্ছা ইত্যাদি।

অতিক্রান্ত (উৎ) : বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল, শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল ইত্যাদি।

বিরোধ (প্রতি) : বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল, বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ ইত্যাদি।

পশ্চাৎ (অনু) : গমনের পশ্চাৎ = অনুগমন, ক্রমের পশ্চাৎ = অনুক্রম, তাপের পশ্চাৎ =অনুতাপ, ধাবনের পশ্চাৎ = অনুধাবন প্রভৃতি।

ঈষৎ (আ) : ঈষৎ নত = আনত, ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম প্রভৃতি।

ক্ষুদ্র অর্থে (উপ) : ক্ষুদ্র শাখা = প্রশাখা, ক্ষুদ্র বিভাগ = উপবিভাগ, ক্ষুদ্র অঙ্গ = প্রত্যঙ্গ, ক্ষুদ্র নদী = উপনদী ইত্যাদি।

যোগ্যতা অর্থে : গুণের যোগ্য = অনুগুণ, প্রেরণার যোগ্য = অনুপ্রেরণা, ভোগের যোগ্য = উপভোগ, রূপের যোগ্য = অনুরূপ, ভাবের যোগ্য = অনুভব, জ্ঞানের যোগ্য = অভিজ্ঞ ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাস

সংজ্ঞা : বহুব্রীহি শব্দটির ব্যুৎপত্তি হলো বংহ (বৃদ্ধি) +উ = বহু; বৃহ +ই = ব্রীহি। এর অর্থ বহু ধান আছে যার এমন লোককে বোঝানো হয়। বাংলা ব্যাকরণে এটি সমাসরূপে পরিচিত। বহুব্রীহি সমাসের সংজ্ঞায় বলা হয়, যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোনো অর্থ প্রকাশ করে, তাই বহুব্রীহি সমাস। যেমন– পোড়া কপাল যার = পোড়াকপাল। এখানে কপাল আক্ষরিক অর্থে আগুনে পুড়ে গেছে এমন কাউকে না বুঝিয়ে মন্দভাগ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রকারভেদ :

বহুব্রীহি সমাস নিম্নোক্ত কয়েক ভাগে বিভক্ত–

১. **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস :** পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন– হত হয়েছে যার শ্রী = হতশ্রী, খোশ মেজাজ যার = খোশমেজাজ, সুন্দর শ্রী যার = সুশ্রী, পুণ্য আত্মা যার = পুণ্যাত্মা, পীত অম্বর যার = পীতাম্বর, নীল বসন যার = নীলবসনা (স্ত্রী), হত ভাগ্য যার = হতভাগ্য, গৌর অঙ্গ যার = গৌরাঙ্গ, নত হয়েছে জানু যার = নতজানু, দশ আনন যার = দশানন ইত্যাদি।

২. **ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস :** বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই যদি বিশেষণ না হয়, তবে তাকে বলা হয় ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস। যেমন– আশীতে (দাঁতে) বিষ যার = আশীবিষ, কথা সর্বস্ব যার = কথাসর্বস্ব, পাপে মতি যার = পাপমতি, পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ, ধর্মে মতি যার = ধর্মমতি, নীল কণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ, দুষ্ট মতি যার = দুষ্টমতি, নদী মাত যার = নদীমাতৃক, ধর্মে প্রাণ আছে যার = ধর্মপ্রাণ, ঊর্ণ নাভিতে যার = ঊর্ণনাভ, বীণা পাণিতে যার = বীণাপাণি ইত্যাদি।

   পরপদ কৃদন্ত বিশেষ্য হলেও ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন– দুই কান কাটা যার = দুকানকাটা, ধামা ধরে যে = ধামাধরা, বোঁটা খসেছে যার = বোঁটাখসা, পা চাটে যে = পা-চাটা ইত্যাদি।

৩. **ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস :** ক্রিয়ার পারস্পরিকতা বুঝাতে যে সমাস হয়, তাকে বলা হয় ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস। এ সমাসে পূর্বপদে আ এবং পরপদে ই যুক্ত হয়। যেমন– হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, কানে কানে যে কথা =

কানাকানি, চুলে চুলে যে লড়াই = চুলাচুলি, গালে গালে যে লড়াই = গালাগালি, লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ = লাঠালাঠি, ঘুষিতে ঘুষিতে যে লড়াই = ঘুষাঘুষি, কোলে কোলে যে মিলন = কোলাকুলি, দন্তে দন্তে যে যুদ্ধ = দন্তাদন্তি ইত্যাদি।

৪. **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস :** বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্ত পদে লোপ পায়, তবে তাকে বলা হয় মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস। যেমন– বিড়ালের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিড়ালচোখী, হাতে খড়ি দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি, গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ ইত্যাদি।

৫. **নঞ বহুব্রীহি সমাস :** বিশেষ্য পূর্বপদের আগে নঞ (না অর্থবোধক) অব্যয়যোগে বহুব্রীহি সমাস করা হলে তাকে নঞ বহুব্রীহি সমাস বলে। নঞ বহুব্রীহি সমাসে সাধিত পদটি বিশেষণ হয়। যেমন– ন (নাই) জ্ঞান যার = অজ্ঞান, না (নাই) চারা (উপায়) = নাচার, নি (নাই) ভুল যার = নির্ভুল, না (নয়) জানা যা = নাজানা, অ (নাই) আদি যার = অনাদি, বে (নাই) ঈমান যার = বেঈমান, অ (নাই) সীমা যার = অসীম, অ (অন্ত) নাই যার = অনন্ত, নির (নাই) মূল যার = নির্মূল, বে (নাই) হুঁ যার = বেহুঁশ, নি (নাই) ভয় যার = নির্ভীক ইত্যাদি।

৬. **প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস :** যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস। যথা– এক দিকে চোখ বা দৃষ্টি যার = একচোখা, ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো, নিঃ (নেই) খরচ যার = নি-খরচ, দো টানা যার = দোটানা, দুই তলা যার = দোতলা, দুই দিকে টান যার = দোটানা, দুই দিকে মন যার = দোমনা ইত্যাদি।

৭. **অলুক বহুব্রীহি সমাস :** যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে বলা হয় অলুক বহুব্রীহি সমাস। এ সমাসে সমস্ত পদটি বিশেষণ হয়। যেমন– মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি, গলায় গামছা যার = গলায়গামছা, হাতে ছড়ি যার = হাতে-ছড়ি, কানে কলম যার = কানে-কলম, গায়ে পড়ে যে = গায়ে-পড়া, হাতে বেড়ি যার = হাতে-বেড়ি, মুখে ভাত যার = মুখে-ভাত, কানে খাটো যে = কানে-খাটো ইত্যাদি।

৮. **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস :** পূর্বপদে সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্ত পদটি বিশেষণ বোঝালে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস বলে। এ সমাসে সমস্ত পদে আ, ই বা ঈ যুক্ত হয়। যেমন– দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজি, চৌ (চার) চাল যে ঘরের = চৌচালা, চৌ কাঠ যার = চৌকাঠ, তিন পায়া যার = তেপায়া, চৌ রাস্তা যার = চৌরাস্তা, দুই নল যার = দুনলা, দশ আনন যার = দশানন, সে (তিন) তারের যন্ত্র = সেতার, পঞ্চ আনন যার = পঞ্চানন ইত্যাদি।

৯. **নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাস :** যে বহুব্রীহি সমাস কোনো নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না, তাকে বলা হয় নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাস। যেমন–দুই দিকে অপ যার = দ্বীপ, অন্তর্গত অপ(জল) যার = অন্তরীপ, নরাকারের পশু যে = নরপশু, জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্মৃত, পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. 'উপশহর' কোন সমাস?

ক) তৎপুরুষ　　খ) অব্যয়ীভাব
গ) বহুব্রীহি　　ঘ) দ্বিগু

২. পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে কোন সমাস হয়?

ক) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি　　খ) ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি
গ) ব্যতিহার বহুব্রীহি　　ঘ) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

৩. যে বহুব্রীহি সমাস কোনো নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না তাকে কী বলে?

ক) নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি　　খ) অলুক বহুব্রীহি
গ) নঞ বহুব্রীহি　　ঘ) ব্যতিহার বহুব্রীহি

৪. 'অনাদি' কোন সমাস?

ক) অব্যয়ীভাব খ) তৎপুরুষ

গ) বহুব্রীহি ঘ) কর্মধারয়

৫. 'প্রতিকূল' কোন সমাসের উদাহরণ?

ক) অব্যয়ীভাব খ) তৎপুরুষ

গ) বহুব্রীহি ঘ) কর্মধারয়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন :

১. সমাসের সাহায্যে কীভাবে নতুন শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২. সমাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৩. উপমান ও উপমিত কর্মধারয় সমাসের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দিন।

৪. অব্যয়ীভাব সমাস কাকে বলে? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৫. তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৬. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন–

জীবন্মৃত, মুখেভাত, গায়েহলুদ, অসীম, নীলকণ্ঠ, উপনদী, অনুক্রম, হাতেকাটা, গরহাজির, ছেলেধরা, অর্ধপথ, দূতাবাস, পাটক্ষেত, শোকার্ত, মধুমাখা, বিপদাপন্ন, ফুলকুমারী, পলান্ন, জীবনস্রোত, চিঠিপত্র, অহি-নকুল।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. ক ৩. ক ৪. গ ৫. ক

পাঠ-৩.৭ : উপসর্গ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- উপসর্গের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- উপসর্গের শ্রেণিকরণ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন উপসর্গের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন বাক্যে এসব উপসর্গের প্রয়োগ দেখাতে পারবেন।

বাংলা ব্যাকরণে কিছু শব্দাংশ ব্যবহৃত হয় যাদের কোনো নিজস্ব অর্থ নেই। কিন্তু নিজস্ব অর্থ না থাকলেও এদের অর্থদ্যোতকতা আছে। অর্থাৎ এই শব্দাংশগুলি অন্য শব্দের পূর্বে বসে শব্দগুলির অর্থের সংকোচন, প্রসারণ, পরিবর্ধন, পরিবর্তন সবই করতে পারে। এভাবে এই শব্দগুলি বাংলা ভাষায় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন শব্দ তৈরিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। এই অর্থবিহীন শব্দাংশগুলোকে উপসর্গ বলা হয়। তবে কোন উপসর্গগুলি কোন শব্দের সঙ্গে যুক্ত হবে সে বিষয়ে বাংলা ব্যাকরণে রয়েছে সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও বিধিমালা। এই পাঠে বাংলা ভাষায় প্রচলিত উপসর্গের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগবিধি আলোচনা করা হয়েছে।

উপসর্গের অর্থ, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

সংজ্ঞা

উপসর্গ হলো কতগুলো বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি। যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না, ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, তাদের উপসর্গ বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বাংলা ভাষায় যেসব অব্যয়সূচক শব্দাংশ ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে বিভিন্ন অর্থের সৃষ্টি করে, তাকে উপসর্গ বলে। যেমন– উপ + হার = উপহার, বি + হার = বিহার, প্র+ হার = প্রহার ইত্যাদি; এখানে উপ, বি, প্র হলো উপসর্গ।

উপসর্গ শব্দের পূর্বে বসে শব্দের অর্থকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে। ফলে বাংলা ভাষার শব্দগঠনে উপসর্গের ভূমিকা রয়েছে।

উপসর্গের বৈশিষ্ট্য

উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে। অর্থাৎ কোনো শব্দ বা পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এরা সংযুক্ত শব্দ বা পদের অর্থের নানারকম পরিবর্তন ঘটায়। নিচে উপসর্গের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেয়া হলো–

১. উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই।
২. এরা নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে।
৩. উপসর্গগুলো বদ্ধরূপমূল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৪. উপসর্গগলো অর্থের সংকোচন, অর্থ পরিবর্তন, অর্থের প্রসার ঘটায়।
৫. এগুলো নামবাচক ও কৃদন্ত শব্দের পূর্বে বসে।

উপসর্গের প্রকারভেদ

বাংলা ভাষায় তিন প্রকার উপসর্গ ব্যবহৃত হয়। এ তিন প্রকার উপসর্গ হলো–

ক. তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ
খ. বাংলা উপসর্গ ও
গ. বিদেশি উপসর্গ

তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ

সংজ্ঞা :

যেসব উপসর্গ সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে সেসব উপসর্গকে বলা হয় তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত উপসর্গ বিশটি। এগুলো হলো– প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নির, দুর, বি, অধি, সু, উদ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ।

নিচে অর্থসহ সংস্কৃত উপসর্গের ব্যবহার দেখানো হলো–

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
প্র	সম্যক	প্রভাব, প্রচলন
	উৎকর্ষ অর্থে	প্রজ্ঞা, প্রভাত, প্রদর্শন
	আধিক্য অর্থে	প্রখর, প্রতাপ, প্রবল, প্রকোপ
	খ্যাতি অর্থে	প্রভাব, প্রখ্যাত, প্রশংসা, প্রকীর্তি
	গতি অর্থে	প্রস্থান, প্রকাশ, প্রচলন, প্রদান
পরা	বিপরীত অর্থে	পরাজয়, পরাভব, পরাধীন, পরাহত
	আতিশয্য অর্থে	পরাকাষ্ঠা, পরাক্রান্ত, পরায়ণ, পরাক্রম
অপ	বিপরীত অর্থে	অপমান, অপকার, অপচয়
	অপকর্ষ অর্থে	অপচয়, অপচেষ্টা, অপকর্ম, অপপ্রচার
	বিকৃত অর্থে	অপমৃত্যু, অপপাঠ, অপভাষা, অপভ্রংশ
	নিকৃষ্ট অর্থে	অপকর্ম, অপযশ, অপসৃষ্টি
	স্থানান্তর অর্থে	অপহরণ, অপসরণ, অপনোদন
সম	সম্যক অর্থে	সমৃদ্ধ, সম্পূর্ণ, সমাদর, সংবাদ
	আধিক অর্থে	সংক্রম, সন্তাপ, সমৃদ্ধ, সম্যস্যক
	মিলন অর্থে	সম্মিলন, সম্মেলন, সংকলন, সঞ্চয়
নি	নেই অর্থে	নিখাদ, নিখুঁত, নিখোঁজ, নিটোল, নিভাঁজ
অব	সম্যক অর্থে	অবরোধ, অবগাহন, অবগত, অবদমন, অবগুণ্ঠিত
অনু	পশ্চাৎ অর্থে	অনুশোচনা, অনুগামী, অনুজ, অনুচর, অনুতাপ
	পৌনঃপুণিকতা অর্থে	অনুক্ষণ, অনুদীন, অনুশীলন
নির	অভাব অর্থে	নিরক্ষর, নির্জীব, নিরাশ্রয়, নির্ধন, নিরন্ন
	বাহির অর্থে	নির্গত, নিঃসরণ, নির্বাসন
	নিশ্চয় অর্থে	নির্ধারণ, নির্ণয়, নির্ভর, নির্দেশ, নিরুদ্ধ
দুর	কষ্টসাধ্য অর্থে	দুর্গম, দুরূহ, দুর্জয়, দুর্নিবার
	মন্দ অর্থে	দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম, দুর্ঘটনা, দুজন
বি	বিশেষ অর্থে	বিধৃত, বিশুদ্ধ, বিজ্ঞান, বিচিত্র, বিজ্ঞ, বিগন্ধ
	অভাব অর্থে	বিনিদ্র, বিবর্ণ, বিফল, বিকর্ণ, বিদেহ
	বিপরীত অর্থে	বিকর্ষণ, বিকল, বিক্রয়, বিদেশ, বিরাগ
সু	উত্তম অর্থে	সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুচরিত্র, সুপ্রিয়, সুনীল, সুশীল, সুজন
	সহজ অর্থে	সুগম, সুসাধ্য, সুলভ, সুবোধ্য
	আতিশয্য অর্থে	সুচতুর, সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ, সুদক্ষ
উৎ	ঊর্ধ্বমুখিতা অর্থে	উদ্যম, উন্নতি, উত্তোলন, উদগ্রীব
	প্রাবল্য অর্থে	উচ্ছ্বাস, উত্তপ্ত, উত্তেজনা, উন্মুক্ত
	অপকর্ষ অর্থে	উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল, উৎকট, উচ্ছেদ, উত্তেজনা
অধি	আধিপত্য অর্থে	অধিকার, অধিপতি, অধিকর্তা, অধিনায়ক

	আয়ত্ত অর্থে	অধিকৃত, অধিগত, অধিভুক্ত, অধিবাসী
	ব্যাপ্তি অর্থে	অধিবাস, অধিগতি
পরি	বিশেষরূপে	পরিপূর্ণ, পরিবর্তন, পরিত্যাগ, পরিপক্ব
	সুন্দর অর্থে	পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি, পরিমার্জিত, পরিস্কার
	চতুর্দিক অর্থে	পরিক্রমণ, পরিমণ্ডল, পরিবৃত্ত, পরিবেশ
প্রতি	সদৃশ অর্থে	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি, প্রতিকৃতি, প্রতিনিধি
	বিরোধ অর্থে	প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বি, প্রতিকার
	পৌণঃপুনিকতা অর্থে	প্রতিদিন, প্রতিমাস, প্রতিগ্রাম, প্রতিঘর
উপ	সম্যক অর্থে	উপকরণ, উপক্রম, উপচার, উপদেশ, উপহার
	ক্ষুদ্র	উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা, উপনদী, উপজেলা
	সামীপ্য অর্থে	উপকণ্ঠ, উপকূল, উপনগর
	সদৃশ অর্থে	উপদ্বীপ, উপবন
অভি	সম্যক অর্থে	অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞ, অভিসার, অভিনিবেশ
	বিশেষ অর্থে	অভিধান, অভিনয়, অভিনেতা, অভিভাবক
	গমন অর্থে	অভিযান, অভিকেন্দ্র, অভিবাসী, অভিবাসন
অতি	অধিক অর্থে	অতিকায়, অতিচালাক, অতিভক্তি, অতিবৃষ্টি
	আতিশয্য অর্থে	অত্যাচার, অতিশয়
	স্বাভাবিকতার বাইরে	অতিপ্রাকৃত, অতিঅলৌকিক
	অতিক্রম অর্থে	অতিমানব, অতিপ্রাকৃত
অপি	ব্যাকরণের সূত্র	অপিনিহিতি
	আরও অর্থে	অপিচ
আ	পর্যন্ত অর্থে	আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র
	ঈষৎ অর্থে	আরক্ত, আভাস
	বিপরীত অর্থে	আদান, আগমন

বাংলা উপসর্গ

সংজ্ঞা : যেসব অব্যয় জাতীয় শব্দ বা শব্দাংশ বাংলা শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে তাদেরকে বাংলা উপসর্গ বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য

১. বাংলা উপসর্গগুলোকে খাঁটি বাংলা উপসর্গ নামে অভিহিত করা হয়।
২. বাংলা ভাষায় কিছু অব্যয় জাতীয় শব্দ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না।
৩. এগুলো সাধারণত নাম শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়।
৪. এদের খাঁটি বাংলা উপসর্গ বলা হয়।

বাংলা উপসর্গ একুশটি। এগুলি হলো–

অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, ঊনা, কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

খাঁটি বাংলা উপসর্গের ব্যবহার

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
অ	নিন্দিত অর্থে	অকাজ, অকেজো, অকাল, অপয়া, অকাট, অপাত্র ইত্যাদি
	অভাব অর্থে	অচিন, অজানা, অথৈ
	না অর্থে	অখুশি, অদেখা, অচেনা, অমিল, অমর, অবলা, অযাচিত
	পরিমাণ অর্থে	অঢেল, অগুনতি, অফুরন্ত

অঘা	বোকা অর্থে	অঘারা, অঘাচণ্ডী, অঘাকাণ্ড, অঘামারা
অজ	নিতান্ত মন্দ অর্থে	অজপাড়া গাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর
অনা	অভাব অর্থে	অনাবৃষ্টি, অনাচার, অনাদায়
	ব্যতীত অর্থে	অনাসৃষ্টি, অনাদৃষ্টি
আ	না অর্থে	আকাড়া, আলুনি, আচালা, আঁছাকা, আঢাকা
	নিকৃষ্ট অর্থে	আকাঠ, আগাছা, আকথা, আকাল,আঘাটা
আড়	প্রায় অর্থে	আড়মোড়, আড়পাগলা
	বিশিষ্ট অর্থে	আড়কোলা, আড়গড়া, আড়কাঠি
আন	নতুন অর্থে	আনকোরা, আনাড়ি
	বিক্ষিপ্ত অর্থে	আনচান, আনমনা
আব	অস্পষ্টতা	আবছায়া, আবজাল
ইতি	এর অর্থে	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে
	পুরান অর্থে	ইতিকথা, ইতিহাস
ঊন	কম অর্থে	ঊনিশ, ঊনবর্ষা, ঊনপাঁজুরে
কদ	নিন্দিত অর্থে	কদবেল, কদাকার
কু	কুৎসিত অর্থে	কুঅভ্যাস, কুকথা, কুনজর, কুকাম, কুকাজ
নি	নাই অর্থে	নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ, নিরেট, নির্দয়
পাতি	ক্ষুদ্র অর্থে	পাতিহাঁস, পাতিশিয়াল, পাতিনেতা, পাতিকাক
বি	নাই অর্থে	বিপথ, বিকল, বিকাল, বিফল
ভর	পূর্ণতা অর্থে	ভরপেট, ভরপুর, ভরদুপুর, ভরযৌবন
রাম	বড় অর্থে	রামছাগল, রামশিঙ্গা, রামদা, রামবোকা
স	সঙ্গে	সলাজ, সরব, সঠিক, সপাট, সস্ত্রীক
সা	উৎকৃষ্ট অর্থে	সাজিরা, সাজোয়ান
সু	উত্তম অর্থে	সুনজর, সুখবর, সুনাম, সুদিন
হা	অভাব অর্থে	হাভাতে, হাঘরে, হাকপাল, হাহুতাশ

বিদেশি উপসর্গ

সংজ্ঞা

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি শব্দের সঙ্গে যেসব উপসর্গ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাদেরকে বিদেশী উপসর্গ বলা হয়। এসব বিদেশি উপসর্গের মধ্যে আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি ইত্যাদি ভাষার উপসর্গ বহুলভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এসব উপসর্গ ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষার সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছে। বাংলা ভাষায় ঠিক কতগুলো বিদেশী উপসর্গ ব্যবহৃত তা জানা নেই।

নিচে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশি উপসর্গের ব্যবহার দেখানো হলো–

ইংরেজি উপসর্গ

উপসর্গ	**ব্যবহৃত অর্থ**	**উদাহরণ**
সাব	অধীন অর্থে	সাব অফিস, সাব এডিটর, সাবজজ
ফুল	সম্পূর্ণ অর্থে	ফুলশার্ট, ফুলবাবু, ফুলহাতা, ফুলপ্যান্ট
হেড	প্রধান অর্থে	হেড অফিস, হেডমাস্টার, হেড পণ্ডিত
হাফ	অর্ধেক অর্থে	হাফ প্যান্ট, হাফ শার্ট, হাফ স্কুল, হাফ টিকিট

ফারসি উপসর্গ

ফি	প্রত্যেক অর্থে	ফি-বছর, ফি হপ্তা, ফি– রোজ, ফি– সব

না	না অর্থে	নামঞ্জুর, নারাজ, নাচার
ব	সাথে অর্থে	বনাম, বকলম, বমাল
কম	অল্প অর্থে	কমবখত, কমআক্কেল, কমজোর
বে	না অর্থে	বেকার, বেয়াদব, বেকসুর, বেহায়া, বেঠিক
বর	মন্দ অর্থে	বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ
বদ	খারাপ অর্থে	বদমাশ, বদহাল, বদমেজাজ, বদরাগী, বজ্জাত
নিম	অর্ধেক অর্থে	নিমরাজি, নিমমোল্লা
দর	অধীন অর্থে	দরপাট্টা, দরখাস্ত, দরপাওনা, দাদালান
কার	কাজ অর্থে	কারচুপি, কারবার, কারসাজি, কারদানি, কারখানা

আরবি উপসর্গ

আম	সাধারণ অর্থে	আমদরবার, আমমোক্তার
খাস	বিশেষ অর্থে	খাসমহল, খাসদখল, খাসকামরা, খাসদরবার
লা	না অর্থে	লাজওয়াব, লাখেরাজ, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা
গর	অভাব অর্থে	গরমিল, গরহাজির, গররাজি

হিন্দি উপসর্গ

হর	প্রত্যেক অর্থে	হররোজ, হরকিসিম, হরেক, হরহামেশা

উপসর্গের বাক্যে প্রয়োগ

ক) বাংলা উপসর্গ

১. **অ– অকাজ** : তার এরকম অকাজ আমি পছন্দ করি না।
২. **আ– আগাছা** : আগাছা পরিষ্কার মানুষ রোবট আবিষ্কারের কথা ভাবছে।
৩. **অনা– অনাবৃষ্টি** : এবার অনাবৃষ্টির কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।
৪. **আন– আনকোরা** : রহমান সাহেব আজ আনকোরা পাঞ্জাবি পরে অফিসে যাচ্ছে।
৫. **অজ– অজপাড়াগাঁ** : অজপাড়াগাঁয়ের মুস্তাফিজুর রহমান এখন ক্রিকেটের বিস্ময়।
৬. **পাতি– পাতিনেতা** : পাতিনেতারা এখন দলের জন্য হুমকিস্বরূপ।
৭. **নি– খরচা** : কাজের জন্য টাকা প্রয়োজন হয়, নিখরচে চলে না।
৮. **রাম– রামছাগল** : তার মত রামছাগল দিয়ে এরূপ মহৎ কাজ অসম্ভব।
৯. **বি– বিকল** : এই গাড়ির ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেছে।
১০. **হা– হাভাতে** : হাড়– হাভাতের দল এখানে এসেছে আমাকে ভীষণ বিপদে ফেলেছে।

খ) সংস্কৃত উপসর্গ

১. **প্র-প্রভাত** : আজি প্রভাতে রবির কর/ কেমনে পশিল প্রাণের পর।
২. **পরা– পরাজিত** : সে জীবনযুদ্ধে একজন পরাজিত সৈনিক।
৩. **অপ– অপমান** : কারো অপমান করা ঠিক নয়।
৪. **সু– সুকোমল** : সুকোমল বিছানায় শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।
৫. **পরি– পরিচয়** : তার পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হলাম।
৬. **প্রতি– প্রতিদান** : খারাপ কাজের প্রতিদান ভালো হয় না।
প্রতিবেশী : প্রতিবেশীর সাথে খারাপ ব্যবহার করা ঠিক নয়।
প্রতিবাদ : অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিৎ।
৭. **অভি– অভিনয়** : সংসারে অনেককেই অভিনয় করতে হয়।
অভিসন্ধি : তার অভিসন্ধি বুঝতে আমাদের দেরী হলো না।

অভিযোগ : সে শুধু সবার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে।

৮. **অতি– অতিবক্তি** : অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।

অতিক্রম : এই বাধা অতিক্রম করা তার পক্ষে সহজ হবে না।

অতিশয় : সে অতিশয় ভালো লোক।

৯. **অনু– অনুশোচনা** : লোকটি খারাপ কাজ করে এখন অনুশোচনায় দগ্ধ।

অনুরাগ : লোকে বলে রাগ নাকি অনুরাগের আয়না।

১০. **উপ– উপদেশ** : শিক্ষকের উপদেশ মানা ছাত্রদের কর্তব্য।

উপভোগ : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে তিনি মুগ্ধ হলেন।

উপজাতি : বাংলাদেশে বিভিন্ন উপজাতি বাস করে।

গ) বিদেশি উপসর্গ

১. **কার– কারবার** : তার কাজ-কারবার আমার পছন্দ হচ্ছে না।

২. **দর– দরখাস্ত** : আকিব জামান ছুটির জন্য দরখাস্ত করেছে।

৩. **না– নাবালক** : নাবালক ছেলেকে বিশ্বাস করে সে ভুল করেছে।

৪. **নিম– নিমরাজি** : মনি বিয়েতে নিমরাজি হয়ে আছে।

৫. **ফি– ফি-সন** : ফি-সন এই সময়েই লোকটি টাকা চাইতে আসে।

৬. **বদ– বদরাগী** : বড় সাহেব খুব বদরাগী, কথায় কথায় সে রাগ করে।

৭. **বে– বেকায়দা** : আদিব জামান কাজটা নিয়ে বড় বেকায়দায় আছে।

৮. **ব– বমাল** : চোর বমাল গ্রেফতার হলো।

৯. **কম– কমজোর** : ভাল খেয়ে না খেয়ে তার শরীরে কম– জোর।

১০. **আম– আমদরবার** : জনতার আমদরবারে যাব এবং এই অন্যায়ের বিচার হবে।

১১. **খাস– খাসকামরা** : রাজার খাসকামরায় মন্ত্রি প্রবেশ করল।

১২. **লা– লা-জওয়াব** : খুব তো পণ্ডিতি দেখালো, এখন দেখছি স্যারের সামনে লা-জওয়াব।

১৩. **বাজে– বাজে কথা** : তোমার বাজে কথায় কান দেয়ার মতো সময় আমার নেই।

১৪. **গর– গরমিল** : হিসেবে গরমিল থাকায় বড় সাহেব চুক্তিতে সই করেননি।

১৫. **ফুল– ফুলহাতা** : আসলাম সাহেব আজ ফুলহাতা শার্ট পরেছেন।

১৬. **হাফ– হাফহাতা** : গরমকালে হাফহাতা শার্ট পরাই ভালো।

১৭. **হাফনেতা** : আজকাল হাফনেতার দাপট বেশি।

১৮. **হর– হরতাল** : হরতালে দেশের অর্থনেতিক অবস্থা নাজুক করে দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. উপসর্গের কাজ কী?

ক) ভাবের পার্থক্য নিরুপণ　　খ) নতুন শব্দ গঠন

গ) সংস্করণ　　ঘ) যতি সংস্করণ

২. শব্দের পূর্বে বসে কোনটি?

ক) বিভক্তি　　খ) প্রত্যয়

গ) উপসর্গ　　ঘ) অনুসর্গ

৩. উপসর্গকে কোন জাতীয় শব্দাংশ বলা হয়?

ক) বিশেষ্য　　খ) সর্বনাম

গ) বিশেষণ　　ঘ) অব্যয়

৪. কার অর্থবাচকতা আছে কিন্তু অর্থদ্যোতকতা নেই?

ক) কারকের খ) অনুসর্গের

গ) উপসর্গের ঘ) সমাসের

৫. বাংলা ভাষায় কত ধরনের উপসর্গ প্রচলিত আছে?

ক) ৩ খ) ২

গ) ১ ঘ) ৪

৬. উপসর্গ প্রধানত কয় প্রকার?

ক) তিন প্রকার খ) চার প্রকার

গ) পাঁচ প্রকার ঘ) ছয় প্রকার

৭. খাঁটি বাংলা উপসর্গ কোনটি?

ক) আম খ) রাম

গ) নিম ঘ) বাম

৮. বিজ্ঞান শব্দের বি উপসর্গ কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক) বিশেষ খ) অভাব

গ) সাধারণ ঘ) গতি

৯. খাঁটি বাংলা উপসর্গ মোট কয়টি?

ক) ১০টি খ) ২০ টি

গ) ১৫টি ঘ) ২১ টি

১০. কোনটি ইংরেজি উপসর্গ?

ক) ফুল খ) আম

গ) গর ঘ) নিম

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গ কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির দুটো করে উদাহরণ দিন।

২. বাংলা ভাষায় উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা কেন উদহারণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. নিচের শব্দগুলো প্রত্যেকটির তিনটি ভিন্ন উপসর্গযোগে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে বাক্যরচনা করুন : শ্বাস, লয়, বাস, বাদ, মান।

৪. নিচের শব্দগুলো থেকে বাংলা, সংস্কৃত ও বিদেশী উপসর্গ যুক্ত শব্দ পৃথক করে দেখান:
প্রণাম, আলুনি, অবেলা, বেহাল, নিখুঁত, গরমিল, সম্পূর্ণ, নিযুক্ত, আজন্ম, পরিপক্ব, খোশ মেজাজ, হরবোলা।

৫. উপসর্গের স্বাধীন অর্থ নেই, কিন্তু নতুন অর্থ সৃষ্টির গুণ আছে। উদাহরণসহ উক্তিটির সভ্যতা যাচাই করুন।

৬. নিচের শব্দগুলো দেয়া হল, বাক্য রচনা নিজে তৈরি করুন।

শ্বাস : বিশ্বাস, নিঃশ্বাস, আশ্বাস

বাদ : অপবাদ, প্রতিবাদ, বিবাদ

লয় : আলয়, প্রলয়, নিলয়

বাস : আবাস, নিবাস, প্রবাস, উপবাস

খান : অপমান, অভিমান, অভিযান

নিজেরা আরও উপসর্গযোগে শব্দ চিন্তা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. গ ৩. ঘ ৪. গ ৫. ক ৬. ক ৭. খ ৮. ক ৯. ঘ ১০. ক

পাঠ-৩.৮ : ধাতু প্রকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ধাতুর সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- ধাতুর প্রকারভেদ করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধাতুর গঠন-বিন্যাস বর্ণনা করতে পারবেন।

ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়াপদের সম্পর্ক রয়েছে। এই দুটি অংশের মধ্যে ক্রিয়াবিভক্তিটি বাদ দিলে যে অপরিহার্য অংশটি বর্তমান থাকে, সেটিই হচ্ছে ধাতু। ধাতু দিয়ে শুধু যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তা-ই নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়াপদের ধাতুর সঙ্গে বিভিন্ন ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে তৈরি করা যায় সংশ্লিষ্ট অসংখ্য নতুন ক্রিয়াপদ। ফলে বাংলা ভাষার শব্দগঠনে ধাতুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান। এই পাঠে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধাতুসমূহের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও গঠনবিন্যাস আলোচনা করা হয়েছে।

ধাতুর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

সংজ্ঞা

ক্রিয়ার মূল অংশকে বলা হয় ধাতু। ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করলে দুটো অংশ পাওয়া যায়– একটি ধাতু বা ক্রিয়ামূল অপরটি ক্রিয়াবিভক্তি। ক্রিয়াপদ থেকে ক্রিয়াবিভক্তি বাদ দিলে যা থাকে তা-ই হলো ধাতু। অর্থাৎ ক্রিয়ামূলের আরেক নাম ধাতু। ড. এনামুল হক এ প্রসঙ্গে বলেন, 'ক্রিয়াপদের যে অবিভাজ্য অংশ এর অন্তর্নিহিত মূল ভাবটির দ্যোতনা করে তাকে ধাতু বলে।' যেমন–

শাহীন কাজটি করছে। আমি কাজটি করছি। সে কাজটি করেছিল।

এ তিনটি বাক্যে করছে, করছি ও করেছিল এ তিনটি ক্রিয়াপদ। এই তিনটি ক্রিয়াপদ একটি 'কর' ধাতু দ্বারা সাধিত হয়েছে। নিচে তিনটি ক্রিয়াপদের ধাতুর রূপ দেখানো হল:

মূল ক্রিয়া	বিভক্তি	ক্রিয়াপদ
কর্+	ছি	করছি
কর্ +	ছে	করছে
কর্ +	ছিল	করছিল

এরকম ধর, কর, জান, যা, খা, ধো, কাঁদ ইত্যাদি হলো ক্রিয়ামূল বা ধাতু। ক্রিয়ামূলকে বা ধাতুকে আবার প্রকৃতিও বলা হয়। ক্রিয়ার মূল বা ধাতু বোঝাতে (√) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ লক্ষ করলে সহজেই ধাতু শনাক্ত করা যায়। কারণ এররূপ আর ধাতুর রূপ এক। যেমন–

(তুই) কর্, যা, খা, দেখ্, লেখ্ ইত্যাদি।

এগুলো যেমন ধাতু হিসেবে গণ্য হয়, তেমনি আবার মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় ক্রিয়াপদ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণবিদগণ সংস্কৃত ভাষার ধাতুর তালিকা দিয়েছেন। তাদের মতে, প্রায় দুই হাজার ধাতু রয়েছে। কিন্তু বেদ, ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে সাতশতের বেশি ধাতুর উদাহরণ পাওয়া যায় না। এসব ধাতুকে বলা হয় 'সিদ্ধ ধাতু'। বাংলা ভাষায় সিদ্ধ, সাধিত প্রভৃতি সকল প্রকারের ধাতুর সংখ্যা ১৫০০ বা এর অধিক। এই ১৫০০-র মধ্যে অনেকগুলো আবার বাংলায় লোপ পেয়েছে এবং নিয়মিতই পাচ্ছে।

ধাতুর প্রকারভেদ

প্রকৃতি ও উৎপত্তি বিচারে বাংলা ধাতুসমূহকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে–

ক) মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু (primary root)

খ) সাধিত ধাতু (derived root)ও
গ) যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু (compound root)

ক) মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু(primary root)

যে ধাতুকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না তাকে বলা হয় মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু। এসব ধাতুর রূপ গঠনের দিক থেকে ন্যূনতম একক। এসব ধাতু আবার স্বয়ংসিদ্ধ ধাতু নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। যেমন– কর, চল, দেখ, খি, যা, আস ইত্যাদি। বাংলা ভাষার মৌলিক ধাতুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১) খাঁটি বাংলা ধাতু ২) সংস্কৃত মূল ধাতু ও ৩) বিদেশি ধাতু

১. **খাঁটি বাংলা ধাতু :** যেসব ধাতুর মূল সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে আসেনি, কিন্তু অপভ্রংশ বা প্রাকৃতের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় এসে ব্যবহৃত হচ্ছে তাকে বলা হয় খাঁটি বাংলা ধাতু। এসব ধাতুকে ভিত্তি করেই বাংলা ক্রিয়াপদ, কৃদন্ত, বিশেষ্য, বিশেষণ ইত্যাদি শব্দ গঠিত হয়েছে। যেমন–
নাচ্– নাচা, কাট্– কাটা, কাঁদ্– কাঁদা ইত্যাদি।
বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক প্রয়োগ করে বাংলা ধাতু চেনা যায়। যেমন– তুই কর, তুই যা, তুই কাট ইত্যাদি।

২. **সংস্কৃত মূল ধাতু :** যে সব ক্রিয়াপদের মূল সংস্কৃত ভাষা থেকে এসে বাংলাভাষায় সরাসরি ব্যবহৃত হচ্ছে সেসব ধাতুকে বলা হয় সংস্কৃত মূল ধাতু। এসব ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ক্রিয়া বিশেষ্য বা ক্রিয়া বিশেষণ গঠিত হয়। যেমন– 'কৃ' ধাতুর সাহায্যে গঠিত পদ – কর, করা ইত্যাদি। আবার 'কৃ' থেকে গঠিত ক্রিয়াপদ– কৃত, কর্তব্য, করণীয়, কর্তৃত্ব ইত্যাদি। অনুরূপভাবে, 'গম' থেকে– গমন করা, গতি, গম, গত ইত্যাদি। 'দা' ধাতু থেকে– দান করা, দাতা, দান, দাতব্য। 'তাজ' ধাতু থেকে– ত্যাগ করা, ত্যাগ, ত্যাজ্য ইত্যাদি।
নিচে সংস্কৃত ধাতু ও এ থেকে গঠিত পদ এবং সংস্কৃত ধাতুর একই অর্থবোধক বাংলা ধাতু এবং তা থেকে গঠিত পদের উদাহরণ দেয়া হলো-

সংস্কৃত ধাতু	সাধিত ধাতু	বাংলা ধাতু	সাধিত ধাতু
অঙ্ক	অঙ্কন, অঙ্কিত	আঁক্	আঁকা
কথ্	কথ্য, কথিত	কহ্	কওয়া, কহন
কৃৎ	কর্তন, কর্তিত	কাট্	কাটা
ক্রন্দ	ক্রন্দন	কাঁদ্	কাঁদা, কাঁদুনে
ক্রী	ক্রয়, ক্রয়ু	কিন্	কেনা, কেনাকাটা
খাদ্	খাদ্য, খাদক	খা	খাওয়া, খাওন
গঠ্	গঠিত	গড়্	গড়া, গড়ন
দৃশ্	দৃশ্য, দর্শন	দেখ্	দেখা, দেখন
পঠ্	পঠন, পাঠ্য, পঠিতপড়	পড়া, পড়ন	
স্থা	স্থান, স্থানীয়	থাক্	থাকা
হস্	হাস, হাসন	হাস্	হাসা, হাসি

৩. **বিদেশি ধাতু :** তৎসম এবং খাঁটি বাংলা ধাতু ছাড়া যেসব ধাতু বিদেশি ভাষা থেকে এসে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে সেসব ধাতুকে বলা হয় বিদেশি ধাতু। প্রধানত হিন্দি, আরবি, ফারসি ভাষা থেকে এসব ধাতু বাংলা ভাষায় এসেছে। যেমন– ভিক্ষে মেগে খায়– এ বাক্যে মাগ ধাতু হিন্দি 'মাঙ' থেকে এসে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে।
এছাড়া আরও কিছু ক্রিয়ামূল রয়েছে যাদের ক্রিয়ামূলের মূল ভাষা নির্ণয় করা কঠিন। এ ধরনের ক্রিয়ামূলকে অজ্ঞাতমূল ধাতু বলে। যেমন– হের ঐ দুয়ারে দাঁড়িয়ে কে? এ বাক্যে 'হের' ধাতুটি কোন ভাষা থেকে এসেছে তা নির্ণয় করা যায়নি। তাই এটি অজ্ঞাতমূল ধাতু হিসেবে গণ্য হয়েছে। নিচে কয়েকটি বিদেশি ধাতুর উদাহরণ দেয়া হলো–

ধাতু	**ব্যবহৃত অর্থ**	**ধাতু**	**ব্যবহৃত অর্থ**
আঁট্	শক্ত করে বাঁধা	ফির্	পুনরাগমন, পুনরাবৃত্তি
খাট্	মেহনত করা	চাহ্	প্রার্থনা করা

টান্	আকর্ষণ	ডাক্	আহবান
টুট্	ছিন্ন হওয়া	লটক্	ঝুলানো
ডর্	ভীত হওয়া	বিগড়্	নষ্ট হওয়া
চেঁচ্	চিৎকার করা	ভিজ্	সিক্ত হওয়া
জম্	ঘনীভূত হওয়া	ঠেল্	ঠেলা

খ) সাধিত ধাতু

যেসব ধাতু বিশ্লেষণ করলে অন্য একটি ধাতু বা নাম শব্দ এবং এক বা একাধিক প্রত্যয় পাওয়া যায় তাকে বলা হয় সাধিত ধাতু। যেমন– দেখ্+আ = দেখা, পড়্ +আ = পড়া, বল্ + আা = বলা ইত্যাদি।

সাধিত ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষবাচক বিভক্তি যোগ করে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন–

মা শিশুকে চাঁদ দেখায়। এখানে দেখ্ +আ + বর্তমান কালের সাধারণ নাম পুরুষের ক্রিয়াবিভক্তি য় = দেখায়। এরূপ শোনায়, বসায়, শেখায় ইত্যাদি।

গঠনরীতি ও অর্থের দিক থেকে সাধিত ধাতু তিন প্রকার। যথা–

১) নাম ধাতু ২) প্রযোজক (ণিজন্ত) ধাতু এবং ৩) কর্মবাচ্যের ধাতু।

১. **নাম ধাতু :** সাধিত ধাতুর মধ্যে যেগুলো বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধনাত্মক শব্দ থেকে গঠিত হয়, সেসব ধাতুকে নাম ধাতু বলা হয়। বিশেষ্য, বিশেষণ এবং অনুকার অব্যয়ের পরে আ প্রত্যয় যোগ করে নাম ধাতু গঠিত হয়। যেমন– লোকটি ঘুমাচ্ছে। এখানে ঘুম থেকে নাম ধাতু ঘুমা গঠিত হয়েছে।
   নাম ধাতু গঠনের কয়েকটি নিয়ম নিচে দেয়া হলো
   ১ : সাধারণ বিশেষ্য বা বিশেষণে আ প্রত্যয় যোগ করে নাম ধাতু গঠন করা হয়। যেমন– লাঠি– লাঠা, দুখ– দুখা, রঙ্গ– রঙ্গা, বাহির– বাহিরা, বিষ-বিষা, জুতা– জুতো ইত্যাদি।
   ২ : ড় বা ট প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্যের পরে আ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নাম ধাতু গঠিত হয়। যেমন– আঁকড়– আঁকড়া, আঁচড়– আঁচড়া, দাবড়– দাবড়া, হাতড়– হাতড়া, চুমড়– চুমড়া ইত্যাদি।
   ৩ : লা বা র প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্যের পরে আ প্রত্যয় যোগ করে নামধাতু গঠিত হয়। যেমন– আগল– আগলা, চুমর– চুমরা, হাঁকর– হাঁকরা, ডুকর– ডুকরা ইত্যাদি।
   ৪ : ম বা চ প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্যের পরে অ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নাম ধাতু গঠিত হয়। যেমন– ঝলস-ঝলসা, ধামস– ধামসা, ভামস– ভামসা, ভাঙ্গচ– ভাঙ্গচা ইত্যাদি।

২. **প্রযোজক বা ণিজন্ত ধাতু :** মৌলিক ধাতুর পরে আ, ওয়া প্রত্যয় যোগ করে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে বলা হয় প্রযোজক ধাতু বা ণিজন্ত ধাতু। এই আ প্রত্যয় এখানে মূলত প্রেরণা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–
   কর + আ = এখানে করা একটি ধাতু। বাক্যে প্রয়োগ– সেলিম কাজটি নিজে না করে অন্যকে দিয়ে করাবে।
   অনুরূপভাবে,
   পড় + আ = পড়া, বাক্যে প্রয়োগ– তিনি ছেলেকে পড়াচ্ছেন।

৩. **কর্মবাচ্যের ধাতু :** মৌলিক ধাতুর সঙ্গে আ প্রত্যয় যোগ করে কর্মবাচ্যের ধাতু গঠিত হয়। এটি বাক্যে ব্যবহারের সময় বাক্যের ক্রিয়াপদকে অনুসরণ করে ব্যবহৃত হয়। যেমন–
   দেখ + আ = দেখা, বাক্যে প্রয়োগ– কাজটি ভালো দেখায় না।
   হার + আ = হারা, বাক্যে প্রয়োগ– যা কিছু হারায় গিন্নি বলে কেষ্টা বেটাই চোর।

গ) যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু

বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধনাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর, দে, পা, খা, ছাড় ইত্যাদি মৌলিক ধাতু যুক্ত হয়ে যে নতুন ধাতু গঠিত হয়, তাকে বলা হয় সংযোগমূলক ধাতু।

নিচে সংযোগমূলক ধাতু যোগে গঠিত কয়েকটি ক্রিয়াপদের উদাহরণ নিচে দেয়া হলো-

১. কর্– ধাতুযোগে–

ক) বিশেষ্যের সঙ্গে — ভয় কর্, লজ্জা কর্, গুণ কর্।
খ) বিশেষণের সঙ্গে — ভাল কর্, মন্দ কর্, সুখী কর্, সন্দেহ কর্।
গ) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে — ক্রয় কর্, দান কর্, দর্শন কর্, রান্না কর্।
ঘ) ক্রিয়াজাত (কৃদন্ত) বিশেষণের সঙ্গে — সঞ্চিত কর্, স্থগিত কর্।
ঙ) ক্রিয়া– বিশেষণের সঙ্গে — জলদি কর্, তাড়াতাড়ি কর্, একত্র কর্।
চ) অব্যয়ের সঙ্গে — না কর্, হ্যাঁ কর্, হায় হায় কর্, ছি ছি কর্।
ছ) ধনাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে — খাঁ খাঁ কর্, বন বন কর্, টন টন কর্।
জ) ধনাত্মক শব্দসহ ক্রিয়া — চট কর্, ধাঁ কর্, হন হন কর্।

২. হ– ধাতুযোগে : বড় হ, ছোট হ, ভালো হ, রাজি হ, সুখী হ, খুশি হ।
৩. দে– ধাতুযোগে : উত্তর দে, ঢাকা দে, দাগা দে, জবাব দে, কান দে, দৃষ্টি দে।
৪. পা– ধাতুযোগে : কান্না পা, ভয় পা, দুঃখ পা, লজ্জা পা, ব্যথা পা, টের পা।
৫. খা– ধাতুয়োগে : মার খা, হিমশিম খা, ছ্যাঁক খা।
৬. কাট্ ধাতুযোগে : সাঁতার কাট্, ভেংচি কাট্, জিভ কাট্, চিমটি কাট্।
৭. ধর্ ধাতুযোগে : গলা ধর্, মাথা ধর্, গোঁ ধর্ ইত্যাদি।
৮. ছাড় ধাতুযোগে : গলা ছাড়, ডাক ছাড়, হাল ছাড়।

ধাতুর ব্যবহার বাংলা ব্যাকরণে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এসব ধাতু ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনে যেমন ভূমিকা পালন করে তেমনি তা বাক্যে ক্রিয়াকে ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে সক্ষম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন-

১. ধাতু কাকে বলে?
ক) পদের মূলকে — খ) ভাষার মূলকে
গ) ক্রিয়ার মূলকে — ঘ) শব্দের মূলকে

২. মৌলিক ধাতুর অপর নাম কী?
ক) নাম ধাতু — খ) কর্ম ধাতু
গ) মৌলিক ধাতু — ঘ) সিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ ধাতু

৩. খাঁটি বাংলা ধাতু কোনটি?
ক) আঁক — খ) অঙ্ক
গ) ডর — ঘ) বধূ

৪. ধাতু কয় প্রকার?
ক) দুই — খ) তিন
গ) চার — ঘ) পাঁচ

৫. নিচের কোনটি অজ্ঞাতমূল ধাতু?
ক) হের — খ) হাস
গ) খা — ঘ) ঘষ

৬. নিচের কোনটি সংস্কৃত ধাতু?
ক. হর — খ. দৃশ
গ. জম — ঘ. কাট

৭. কোনটি খাঁটি বাংলা ধাতু?
ক. কৃ — খ. টান

গ. হাস ঘ. আট

৮. কোনটি বিদেশী ধাতু?

ক. ডর খ. কৃৎ

গ. চিব্ ঘ. শুন

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. ধাতু কাকে বলে? ধাতু কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকার ধাতুর একটি করে উদাহরণ দিন।

২. সাধিত ধাতু কয় শ্রেণীতে বিভক্ত? প্রত্যেকটি শ্রেণীর সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দিন।

৩. মৌলিক ধাতু কয়প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখুন।

৪. বিভিন্ন পদের সঙ্গে 'হ', দে, খা, বাস ও পা ধাতুযোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ তৈরি করুন?

৫. সংস্কৃত মূল ধাতু ও বাংলা মূল ধাতুর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. ঘ ৩. ক ৪. খ ৫. ক ৬. খ ৭. গ ৮. ক

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর পাঠগুলো পড়ে নিজে তৈরি করুন।

পাঠ-৩.৯ : প্রত্যয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- প্রত্যয় কাকে বলে তা আপনি বলতে পারবেন।
- প্রত্যয়ের গঠন সম্পর্কে বলতে পারবেন।

প্রত্যয় ভাষার শব্দ গঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই প্রত্যয়ের আলোচনা আধুনিক ব্যাকরণে রূপতত্ত্ব অংশে স্থান পেয়েছে। বাংলা ভাষায় শব্দগঠনে প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান।

যেসব শব্দাংশ শব্দের পরে বসে নতুন শব্দগঠনে ভূমিকা পালন করে অথবা শব্দের প্রসারে ভূমিকা পালন করে তাকে বলা হয় প্রত্যয়।

প্রত্যয়ের প্রকারভেদ : প্রত্যয় সাধারণত দুই প্রকার–

কৃৎ প্রত্যয় ও
তদ্ধিত প্রত্যয়।

কৃৎ প্রত্যয় : উৎস অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কৃৎ প্রত্যয়সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো : বাংলা কৃৎ প্রত্যয় ও সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়। নিচে বিভিন্ন ধরনের কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া হলো।

বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

অ √ধর্+অ= ধর
√মার্+অ = মার

অন (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)
√কাঁদ্+অন = কাঁদন
√নাচ্+অন = নাচন
√বাড়্+অন= বাড়ন
√ঝুল্+অন = ঝুলন
√দুল্+অন = দোলন ধাতুর শেষে 'আ-কার' থাকলে 'ওন' হয়। যেমন–
√খা+অন = খাওন
√ছা+অন = ছাওন
√দে+অন = দেওন

অনা √দুল্+অনা = দোলনা
√খেল্+অনা = খেলনা

অনি/উনি √চির+অনি = চিরনি > চিরুনি
√বাঁধ্+অনি = বাঁধুনি
√আঁট্+অনি = আঁটুনি

অন্ত
√উড়্+অন্ত = উড়ন্ত (বিশেষণ গঠনে ব্যবহৃত হয়)
√ডুব্+অন্ত = ডুবন্ত

অক √মুড়্+অক = মোড়ক

√ঝল্+অক = ঝলক

আ √পড়্+আ = পড়া

√রাঁধ্+আ = রাঁধা

√কেন্+আ = কেনা

√কাচ্+আ = কাচা

√ফুট্+আ = ফোটা?

আই

√চড়্+আই = চড়াই (ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)

√সিল্+আই = সিলাই

আও

√পাকড়্+আও = পাকড়াও (ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)

√চ্+আও = চড়াও

আন(আনো)

√জানা+আন = জানানো (প্রযোজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতুর পরে বসে)

√শোনা+আন = শোনানো

√ভাসা+আন = ভাসানো

√চাল+আন = চালানো/চালান

√মান+আন = মানান/মানানো

আনি

√জান্+আনি = জানানি

√শুন্+আনি = শুনানি

√উড়্+আনি = উড়ানি

(√উড়্+উনি = উড়ুনি)

আরি/আরী/রি/উরি

√ডুব্+আরি/উরি = ডুবুরি

√ধুন্+আরী = ধুনারী

√পূজা+আরী = পূজারী

আল

√মাত্+আল = মাতাল

√মিশ্+আল = মিশাল

ই

√ভাজ্+ই = ভাজি

√বেড়্+ই = বেড়ি

ইয়া/ইয়ে

√মর্+ইয়া = মরিয়া

√বল্+ইয়ে = বলিয়ে

√নাচ্+ইয়ে = নাচিয়ে

√গা+ইয়ে = গাইয়ে

√লিখ্+ইয়ে = লিখিয়ে

√বাজ্+ইয়ে = বাজিয়ে

√ক্+ইয়ে = কইয়ে

উ

√ডাক্+উ = ডাকু

√ঝাড়্+উ = ঝাড়ু দ্বিত্বপ্রয়োগ : √উড়্+উ = উড়ুউড়ু

উয়া/ও

√পড়্+উয়া = পড়ুয়া

√উড়্+উয়া = উড়ুয়া > উড়ো/

√উড়্+ও = উড়ো

তা

√ফির্+তা = ফিরতা > ফেরতা(বিশেষণ গঠনে ব্যবহৃত হয়)

√পড়্+তা = পড়তা

√বহ্+তা = বহতা

তি

√ঘাট্+তি = ঘাটতি (বিশেষণ গঠনে ব্যবহৃত হয়)

√বাড়্+তি = বাড়তি

√কাট্+তি = কাটতি

√উঠ্+তি = উঠতি

না

√কাঁদ্+না = কাঁদনা > কান্না (বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)

√রাঁধ্+না = রাঁধনা > রান্না

√ঝর্+না = ঝরনা

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

অন(ট)

√নী+অনট > নে+অন = নয়ন

√শ্রচ+অনট = শ্রবণ

√স্থা+অনট = স্থান

√ভোজ+অনট = ভোজন

√নৃত+অন = নর্তন

√দৃশ্+অন = দর্শন

√নন্দি+অনট = নন্দন

ক্ত

√জ্ঞা+ক্ত = জ্ঞাত

√খ্যা+ক্ত = খ্যাত

√পঠ্+ক্ত = পঠিত কিছু কিছু ধাতুর শেষে 'ই-কার' যুক্ত হয়।

√লিখ্+ক্ত = লিখিত

√বিদ্+ক্ত = বিদিত

√বেষ্ট+ক্ত = বেষ্টিত

√চল্+ক্ত = চলিত

ক্তি

√গম্+ক্তি = গতি
√মন্+ক্তি = মতি
√রম্+ক্তি = রতি

কিছু ধাতুর শেষের ব্যঞ্জন লোপ পায়।

√শ্রম্+ক্তি = শ্রান্তি
√শম্+ক্তি = শান্তি

কিছু ধাতুর প্রথম ব্যঞ্জনে আ-কার যুক্ত হয়।

√বচ্+ক্তি = উক্তি
√মুচ্+ক্তি = মুক্তি
√ভজ্+ক্তি = ভক্তি

তব্য

√কৃ+তব্য = কর্তব্য
√দা+তব্য = দাতব্য
√পঠ্+তব্য = পঠিতব্য

অনীয়

√কৃ+অনীয় = করণীয়
√রক্ষ+অনীয় = রক্ষণীয়
√দৃশ্+অনীয় = দর্শনীয়
√পান্+অনীয় = পানীয়
√শ্রচ্+অনীয় = শ্রবণীয়
√পালন+অনীয় = পালনীয়

তৃচ

√দা+তৃচ = দাতা
√মা+তৃচ = মাতা
√ক্রী+তৃচ = ক্রেতা
√যুধ্+তৃচ = যোদ্ধা

ণক

√পঠ্+ণক = পাঠক
√ণী+ণক > নৈ+অক = নায়ক
√গৈ+ণক = গায়ক

√লিখ্+ণক = লেখক
√পূঁজি+ণক = পূজক
√জনি+ণক = জনক
√চালি+ণক = চালক
√স্তাবি+ণক = স্তাবক

প্রযোজক ধাতুর শেষে 'ই-কার' থাকলে লোপ পায়।

√দা+ণক = দায়ক

ধাতুর শেষে 'আ-কার' থাকলে অতিরিক্ত 'য়' যুক্ত হয়।

য

√দা+য >√দে+য = দেয়

√হা+য >√হে+য = হেয়
বি+√ধা+য = বিধেয়
অ+√জি+য = অজেয়
পরি+√মা+য = পরিমেয়
অনু+√মা+য = অনুমেয়

√গম্+য = গম্য শেষে ব্যঞ্জন থাকলে য-ফলা হয়।
√লভ্+য = লভ্য

ণিন

√গ্রহ+ণিন =গ্রাহী
√পা+ণিন = পায়ী
√কৃ+ণিন = কারী
√দ্রোহ+ণিন = দ্রোহী
সত্য+√বাদ+ণিন = সত্যবাদী
√ভাব্+ণিন = ভাবী
√স্থা+ণিন = স্থায়ী
√গম্+ণিন = গামী

√হন্+ণিন = ঘাতী 'হন' ধাতুর ক্ষেত্রে
আত্ম+√হন+ণিন = আত্মঘাতী

ইন

√শ্রম+ইন =শ্রমী

অল

√জি+অল = জয়
√ক্ষি+অল = ক্ষয়
√নিচ্+অল = নিচয়
√বিন্+অল = বিনয়
√বিল্+অল = বিলয় √হন+অল = বধ

ইষ্ণু

√চল্+ইষ্ণু = চলিষ্ণু
√ক্ষয়+ইষ্ণু = ক্ষয়িষ্ণু
√বর্ধ+ইষ্ণু = বর্ধিষ্ণু

বর

√ঈশ্+বর = ঈশ্বর
√ভাস্+বর = ভাস্বর
√নশ্+বর = নশ্বর
√স্থা+বর = স্থাবর

র

√হিন্+স+র = হিংস্র
√নম্+র = নম্র

উক/ঊক

√ভু+উক > ভৌ+উক = ভাবুক

√জাগৃ+ঊক = জাগরূক

শানচ

√দীপ্+শানচ = দীপ্যমান

√চল্+শানচ = চলমান

√বৃধ্+শানচ = বর্ধমান

ঘঞ

√বস্+ঘঞ = বাস

√যুজ্+ঘঞ = যোগ

√ক্রুধ্+ঘঞ = ক্রোধ

√খদ্+ঘঞ = খেদ

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

আ

চোর্+আ = চোরা

কেষ্ট+আ = কেষ্টা

ডিঙি+আ = ডিঙা

বাঘ্+আ = বাঘা

হাত্+আ = হাতা

লুন্+আ = লুনা > লোনা

আই

বড়+আই = বড়াই

মিঠা+আই = মিঠাই

ঢাকা+আই = ঢাকাই

পাবনা+আই = পাবনাই

চোর+আই = চোরাই

মোগল+আই = মোগলাই

আমি/আম/

আমো/মি

ইতর+আমি = ইতরামি

পাগল+আমি = পাগলামি

চোর+আমি = চোরামি

বাঁদর+আমি = বাঁদরামি

ফাজিল+আমো = ফাজলামো

ঠক্+আমো = ঠকামো

ঘর্+আমি = ঘরামি

জেঠা+মি = জেঠামি

ছেলে+মি = ছেলেমি

ই/ঈ

বাহাদুর+ই = বাহাদুরি
উমেদার+ই = উমেদারি
ডাক্তার+ই = ডাক্তারি
মোক্তার+ই = মোক্তারি
পোদ্দার+ই = পোদ্দারি
ব্যাপার+ঈ = ব্যাপারী
সরকার+ই = সরকারি

ইয়া > এ

সেকাল+এ = সেকেলে
একাল+এ = একেলে
ভাদর+ইয়া = ভাদরিয়া > ভাদুরে
পাথর+ইয়া = পাথুরিয়া > পাথুরে
মাটি+ইয়া = মেটে
বালি+ইয়া = বেলে
জাল+ইয়া = জালিয়া > জেলে
মোট+ইয়া = মুটে খুন+ইয়া = খুনিয়া > খুনে
না+ইয়া = নাইয়া > নেয়ে
দেমাক+এ = দেমাকে

উয়া > ও

জ্বর+উয়া = জ্বরুয়া > জ্বরো
বাত+উয়া = বাতুয়া > বেতো
টাক+উয়া = টাকুয়া > টেকো
খড়+ও = খড়ো
ধান+উয়া = ধেনো
মাঠ+উয়া = মেঠো
গাঁ+উয়া = গাঁইয়া > গেঁয়ো

উ

ঢাল+উ = ঢালু
কল+উ = কলু

উক

লাজ+উক = লাজুক
মিশ+উক = মিশুক
মিথ্যা+উক = মিথ্যুক

আরি/আরী/আরু

ভিখ+আরী = ভিখারী
শাঁখ+আরী = শাঁখারী
বোমা+আরু = বোমারু

আলি/আলো/আল>এল

দাঁত+আল = দাঁতাল
লাঠি+আল = লাঠিয়াল > লেঠেল
তেজ+আল = তেজাল

ধার+আল = ধারাল
শাঁস+আল = শাঁসাল
জমক+আল = জমকালো
দুধ+আল = দুধাল > দুধেল
হিম+আল = হিমাল > হিমেল
চতুর+আলি = চতুরালি
ঘটক+আলি = ঘটকালি
সিঁদ+আল>এল = সিঁদেল
গাঁজা+আল>এল = গেঁজেল

উরিয়া>উড়িয়া/উড়ে/রে

হাট+উরিয়া = হাটুরিয়া > হাটুরে
সাপ+উড়িয়া = সাপুড়িয়া > সাপুড়ে
কাঠ+উরিয়া = কাঠুরিয়া > কাঠুরে

উড়

লেজ+উড় = লেজুড়

উয়া/ওয়া>ও

ঘর+ওয়া = ঘরোয়া
জল+উয়া = জলুয়া > জলো

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

ইত

কুসুম+ইত = কুসুমিত
তরঙ্গ+ইত = তরঙ্গিত
কণ্টক+ইত = কণ্টকিত

ইমন/ইমা

নীল+ইমন = নীলিমা
মহৎ+ইমন = মহিমা

ইল

পঙ্ক+ইল = পঙ্কিল
ঊর্মি+ইল = ঊর্মিল
ফেন+ইল = ফেনিল

ইষ্ঠ

গুরু+ইষ্ঠ = গরিষ্ঠ
লঘু+ইষ্ঠ = লঘিষ্ঠ

ইন/ঈ/ইনী

জ্ঞান+ইন = জ্ঞানিন
সুখ+ইন = সুখিন
গুণ+ইন = গুণিন

তা/ত্ব

শত্রু+তা = শত্রুতা
বন্ধু+তা = বন্ধুতা

বন্ধু+ত্ব = বন্ধুত্ব
গুরু+ত্ব = গুরুত্ব
ঘন+ত্ব = ঘনত্ব
মহৎ+ত্ব = মহত্ত্ব

তর/তম

মধুর+তর = মধুরতর
প্রিয়+তর = প্রিয়তর
প্রিয়+তম = প্রিয়তম

নীন/ঈন(ন ইৎ)

সর্বজন+নীন = সর্বজনীন
কুল+নীন = কুলীন
নব+নীন = নবীন

নীয়/ঈয়(ন ইৎ)

জল+নীয় = জলীয়
রাজা+নীয় = রাজকীয়

বতুপ/মতুপ

বান/মান

গুণ+বতুপ = গুণবান
দয়া+বতুপ = দয়াবান
বুদ্ধি+মতুপ = বুদ্ধিমান

বিন/বী

মেধা+বিন = মেধাবী
মায়া+বিন = মায়াবী
তেজঃ+বিন = তেজস্বী
যশঃ+বিন = যশস্বী

র

মধু+র = মধুর
মুখ+র = মুখর

ল

শীত+ল = শীতল
বৎস+ল = বৎসল

ষ্ণ(অ)

মনু+ষ্ণ = মানব
যদু+ষ্ণ = যাদব
শিব+ষ্ণ = শৈব
জিন+ষ্ণ = জৈন
শক্তি+ষ্ণ = শাক্ত
বুদ্ধ+ষ্ণ = বৌদ্ধ

ষ্ণ্য(য)

মনুঃ+ষ্ণ্য = মনুষ্য
জমদগ্নি+ষ্ণ্য = জামদগ্ন্য
সুন্দর+ষ্ণ্য = সৌন্দর্য

পর্বত+ষ্ণ্য = পার্বত্য
বেদ+ষ্ণ্য = বৈদ্য

ষ্ণি(ই)

রাবণ+ষ্ণি = রাবণি
দশরথ+ষ্ণ্য = দাশরথি

ষ্ণিক(ইক)

সাহিত্য+ষ্ণিক = সাহিত্যিক
বেদ+ষ্ণিক = বৈদিক
বিজ্ঞান+ষ্ণিক = বৈজ্ঞানিক
সমুদ্র+ষ্ণিক = সামুদ্রিক
নগর+ষ্ণিক = নাগরিক
মাস+ষ্ণিক = মাসিক
ধর্ম+ষ্ণিক = ধার্মিক
সমর+ষ্ণিক = সামরিক

ষ্ণেয়(এয়)

ভগিনী+ষ্ণেয় = ভাগিনেয়
অগ্নি+ষ্ণেয় = আগ্নেয়
বিমাতৃ+ষ্ণেয় = বৈমাত্রেয়

বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়

হিন্দি

ওয়ালা>আলা

বাড়ি+ওয়ালা = বাড়িওয়ালা
দিল্লি+ওয়ালা = দিল্লিওয়ালা
মাছ+ওয়ালা = মাছওয়ালা
দুধ+ওয়ালা = দুধওয়ালা

ওয়ান>আন

গাড়ি+ওয়ান = গাড়োয়ান
দার+ওয়ান = দারোয়ান

আনা>আনি

মুনশি+আনা = মুনশিআনা/মুন্সিয়ানা
বিবি+আনা = বিবিআনা/বিবিয়ানা
হিন্দু+আনি = হিন্দুআনি/হিন্দয়ানি

পনা

ছেলে+পনা = ছেলেপনা
গিন্নি+পনা = গিন্নিপনা
বেহায়া+পনা = বেহায়াপনা

দার

খবর+দার = খবরদার
তাঁবে+দার = তাঁবেদার
বুটি+দার = বুটিদার

দেনা+দার = দেনাদার
চৌকি+দার = চৌকিদার
পাহারা+দার = পাহারাদার

বাজ

কলম+বাজ = কলমবাজ
ধড়ি+বাজ = ধড়িবাজ
ধোঁকা+বাজ = ধোঁকাবাজ
গলা+বাজ = গলাবাজ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন।

১. বাংলা ভাষায় কৃৎ প্রত্যয় কত প্রকার?

ক. দুইপ্রকার　　খ. চার প্রকার
গ. তিন প্রকার　　ঘ. পাঁচ প্রকার

২. 'দেনা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?

ক. দে+না　　খ. দে+অনা
গ. দি+না　　ঘ. দা+ইনি

৩. 'মাতা'র সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?

ক. মা+তা　　খ. ম+আতা
গ. মাতৃ+আ　　ঘ. মা+তৃচ

৪. 'মুক্ত'র সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?

ক. মুহ+ত　　খ. মুচ+ক্ত
গ. মুক+ত　　ঘ. মু+ক্ত

৫. তদ্ধিত প্রত্যয় কত প্রকার?

ক. দুই　　খ. তিন
গ. চার　　ঘ. পাঁচ

৬. শব্দের সঙ্গে যে সব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে বলে

ক. তদ্ধিত প্রত্যয়　　খ. ধাতু প্রকৃতি
গ. কৃৎ প্রত্যয়　　ঘ. নাম প্রকৃতি

৭. নাম প্রকৃতিকে এক অর্থে বলা যায়–

ক. যৌগিক শব্দ　　খ. মৌলিক শব্দ
গ. তৎসম শব্দ　　ঘ. বিদেশী শব্দ

৮. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে

ক. ক্রিয়া বিভক্তি বলে　　খ. প্রত্যয় বলে
গ. ধাতু বলে　　ঘ. প্রাতিপদিক বলে

৯. ধাতু বা শব্দের পর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যে বর্ণ বা বর্ণসমূহ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে সেগুলো

ক. সমাস　　খ. উপসর্গ
গ. প্রত্যয়　　ঘ. কারক

১০. কোন শব্দটি বিদেশী প্রত্যয়ের উদাহরণ?

ক. দাপট　　খ. ফুলদানি

গ. গমন ঘ. বিজ্ঞান

১১. কোন শব্দটিতে প্রত্যয় 'জাত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. পাবনাই খ. বড়াই

গ. ডাক্তার ঘ. লেজুড়

১২. কোন শব্দটিতে প্রত্যয় সাদৃশার্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. ছোয়াচ খ. চাঁদপানা

গ. লাজুক ঘ. পূজারী

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রত্যয় কাকে বলে ও কয় প্রকার উদাহরণসহ লিখুন। বাংলা সাহিত্যে প্রত্যয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

২. কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের পার্থক্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. কৃৎ প্রত্যয়ের পাঁচটি ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের পাঁচটি উদাহরণ লিখুন।

৪. নিচের প্রত্যয়গুলোর সাহায্যে শব্দগঠন করুন– অক, ইয়া, আনা, দার, ত্ব, তা, অনীয়, আন, অনা।

৫. নিচের শব্দগুলোর প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় করুন :

ঝাড়ন, পাওনা, দোলনা, রাঁধুনি, জীয়ন্ত, লড়াই, যাচাই, ডাকাত, ঘেরাও, ডুবুরি, ফলন্ত, ডুবুডুবু, শ্রবণ, জ্ঞাত, জটা, জমাট, মেটে, মৃন্ময়, মেছো, ছেলেমি, রাঘব, পাণ্ডব,নেতৃত্ব, ঘুষখোর, চাঁদাবাজ, প্রাচ্য, টেকসই, গ্রাম্য, মেধাবি, দৈনিক, সাংবাদিক, চপলতা, মধুর, দাতাগিরি, সাহিত্যিক, দর্শনীয়, শ্রদ্ধাবান, ধড়িবাজ, পানীয, পার্থিব, পৌরহিত্য, জীয়ন্ত, কুশর, জ্যান্ত, ভূমিসাৎ, হলদে, ডাকাত, চড়াই, বাছাই, গন্তব্য, বসতি, চাহনী, শৈশব, বহতা, কাঁদুনে, জলো, তালব্য, সাংবাদিক, আর্থিক।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. ক ৩. খ ৪. ঘ ৫. ক ৬. ক ৭. খ ৮. ঘ ৯. গ ১০. খ ১১. ক ১২. খ

পাঠ-৩.১০ : শব্দের শ্রেণিবিভাগ– গঠনমূলক, অর্থমূলক ও উৎসমূলক

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- শব্দ কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- গঠন অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবেন।
- অর্থ অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবেন।
- উৎপত্তি বা উৎস দিক থেকে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে বলা হয় শব্দ। এক বা একাধিক ধ্বনি একত্রিত হয়ে যখন মনের ভাব প্রকাশ করে, তখন তাকে বলা হয় শব্দ। শব্দ হলো ভাষার ক্ষুদ্রতম একক। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শব্দের সংজ্ঞায় বলেছেন, 'অর্থপূর্ণ ধ্বনিকে বলে শব্দ (word)। কোনো বিশেষ সমাজের নরনারীর কাছে যে ধ্বনির স্পষ্ট অর্থ আছে, সেই অর্থযুক্ত ধ্বনি আছে, সে সমাজের নরনারীর ভাষার শব্দ।'

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের সংখ্যা ব্যাপক ও বিস্তৃত। এর সংখ্যা যেমন কয়েক লক্ষে পৌঁছেছে, তেমনি বিষয়গত বৈচিত্র্যেও এরা অগণিত। মূলত দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদে বিপুল বাঙালি জনগোষ্ঠি প্রত্যহ তাদের বিচিত্র ভাবনা ও বিষয়কে প্রকাশ করতে হয়। আর এসব ভাবনা ও বিষয়ের জন্য রয়েছে বিচিত্র শব্দভাণ্ডার। এই শব্দভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত শব্দগুলোর সাংগঠনিক ও অর্থগত রকমফের ও মাত্রা রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহ এসেছে উৎপত্তিগত তাৎপর্যও রয়েছে। অর্থাৎ এই শব্দগুলো বিভিন্ন ভাষা উৎস থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে। সে অনুযায়ী বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সকল শব্দকে তিন ভাগে ব্যাখ্যা করা যায়। যথা–

i. গঠন অনুসারে
ii. অর্থ অনুসারে ও
iii. উৎস অনুসারে

নিচে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের গঠনগত, অর্থগত ও উৎপত্তিগত শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করা হয়েছে।

গঠন অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ

গঠনগত দিক থেকে বাংলা শব্দকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে–

মৌলিক শব্দ : যে শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে বলা হয় মৌলিক শব্দ। উদাহরণ– আম, কলা, দেশ, গোলাপ, ভাই, বোন, হাত, পা, নাক, মাটি, ঘর, বউ ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ : যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায়, এক কথায় তাকেই বলা হয় সাধিত শব্দ। অন্যভাবে বলা যায়, মৌলিক শব্দ বা ধাতুর সাথে বিভিন্ন প্রকার প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ যোগ করে যে শব্দ গঠিত হয়, তাকে বলা হয় সাধিত শব্দ । যেমন– দেশি, মাটির, বোনের, হাতগুলো, বউটি, গোলাপী, ভাইয়ে ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ আবার তিনভাবে গঠিত হয়– সমাস সাধিত, প্রত্যয় সাধিত এবং উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ।

সমাস সাধিত : দু বা ততোধিক পদ এক পদের পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় সমাস। সমাসের সাহায্যে বাংলা ভাষায় বিভিন্নভাবে শব্দ গঠিত হয়। যেমন– তিন তারের সমাহার = সেতার, যিনি রাজা তিনিই ঋষি = রাজর্ষি। সমাসযোগে গঠিত আরও শব্দ হল ত্রিভূবন, ত্রিরত্ন, কানাকানি, বেয়াদব, হতভাগ্য, পীতাম্বর, নীলকণ্ঠ, ধামাধারা, ধর্মপ্রাণ, আশীবিষ, হাতাহাতি, কোলাকুলি, অসীম, যাদুকর, চিত্রকর, তেলেভাজা, শিক্ষামন্ত্রি, ধামাচাপা ইত্যাদি।

প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ : মোগলাই, টাকায়, ঢাকাই ইত্যাদি।

উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ : সুনাম, প্রহার, বিহার, আহার, উপসর্গ, উপহার, উপঢৌকন ইত্যাদি।

শব্দের অর্থগত শ্রেণিবিন্যাস

অর্থগতভাবে শব্দকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা– যৌগিক শব্দ, রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ এবং যোগরূঢ় শব্দ।

যৌগিক শব্দ : যেসব শব্দের অর্থ তাদের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ অনুযায়ী হয়ে থাকে, তাকে বলা হয় যৌগিক শব্দ। অন্যভাবে বলা যায়, যেসব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ এক, সেসব শব্দকে বলা হয় যৌগিক শব্দ। যেমন–

কৃ + তব্য = কর্তব্য, অর্থ– যা করা উচিত

বাবু + আনা = বাবুয়ানা, অর্থ– যিনি বাবুর ভাব নিয়ে চলেন।

পিতা + হীন = পিতৃহীন, অর্থ– যার পিতা নেই।

এরূপ আরও শব্দের উদাহরণ হলো– গুণবান, পাঠক, মিতালি, ভাড়াটে, সংবাদদাতা, বিদ্যালয়, পাচক, এরূপ শব্দ হলো গুণবান, পাঠক, মিতালি, ভাড়াটে, সংবাদদাতা, বিদ্যালয়, পাচক, চরণ, পক্ষী ইত্যাদি।

রূঢ় বা রূঢ়ী শব্দ : যে সব শব্দের অর্থ তাদের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থের অনুগামী না হয়ে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, সেসব শব্দকে বলা হয় রূঢ় বা রূঢ়ী শব্দ। উদাহরণ-

শব্দ	**মূল অর্থ**	**পরিবর্তিত অর্থ**
সন্দেশ	সংবাদ	মিষ্টান্ন
চিকন	চকচকে	সরু
জ্যাঠামি	জেঠার ভাব	চাপল্য
প্রবীণ	প্রকৃষ্ট বীণাবাদক	বয়স্ক ব্যক্তি

এরূপ আরও শব্দ হলো– অতিথি, কুশল, গবাক্ষ, দুহিতা, পাঞ্জাবি, বাঁশি, রাখাল, স্নাতক ইত্যাদি।

যোগরূঢ় শব্দ : সমাসনিষ্পন্ন যেসব শব্দ তার ব্যাসবাক্যের কোনো অর্থ প্রকাশ না করে, তৃতীয় কোনো অর্থ প্রকাশ করে, সেসব শব্দকে বলা হয় যোগরূঢ় শব্দ। যেমন–

জলদ– মূল অর্থ যে জল দেয়, ব্যবহারিক অর্থ হলো মেঘ,

পঙ্কজ– শব্দের অর্থ যা পঙ্কে জন্মে, কিন্তু ব্যবহারিক অর্থ পদ্ম।

এরূপ আরও উদাহরণ হলো– মন্দির, জলদ, রাজপুত, অন্ন, জলধি, মহাযাত্রা, সরোজ ইত্যাদি।

উৎস অনুসারে শব্দকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা–

১. তৎসম শব্দ,
২. অর্ধ-তৎসম শব্দ,
৩. তদ্ভব শব্দ,
৪. দেশি শব্দ ও
৫. বিদেশি শব্দ।

নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

ক. তৎসম শব্দ : তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ [তৎ = তার, সম = সমান] তার সমান। এখানে 'তার' বলতে 'সংস্কৃত'র সমান বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার যেসব শব্দ সরাসরি এসে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তৎসম শব্দ। উদাহরণ– চন্দ্র, সূর্য, ধর্ম, বৃক্ষ, মানব, পুত্র, রাত্রি, পর্বত, ভূমি, সিংহ, তাপসী, প্রশ্ন, পাত্র, জলধি ইত্যাদি।

খ. অর্ধ-তৎসম শব্দ : যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে আংশিক পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে সেসব শব্দকে বলা হয় অর্ধ-তৎসম শব্দ। লোকমুখে উচ্চারণের অপপ্রয়োগের ফলে তৎসম শব্দ বিকৃত হয়ে অর্ধ-তৎসম শব্দে পরিণত হয়েছে। উদাহরণ–

তৎসম	**অর্ধ-তৎসম**	**তৎসম**	**অর্ধ-তৎসম**

চন্দ্র	চন্দর	রত্ন	রতন
গৃহস্থ	গেরস্থ	কুম্ভাকার	কুমার
তারকা	তারা	রৌদ্র	রোদ্দুর
বিশ্রী	বিচ্ছিরি	গাত্র	গতর
ছত্র	ছাতা	গৃহিনী	গিন্নী
শ্রী	ছিরি	বৃষ্টি	বিষ্টি
মিথ্যা	মিছে	ঘৃণা	ঘেন্না
কর্মকার	কামার	লৌহ	লোহা

গ. তদ্ভব শব্দ : তদ্ভব একটি পারিভাষিক শব্দ। এই 'তদ্ভব' পরিভাষার 'তৎ' = তার, এবং ভাব ('ভব') = উৎপন্ন অর্থ বুঝায়। এখানেও 'তার' বলতে 'সংস্কৃত'কে নির্দেশ করছে। অর্থাৎ যেসব শব্দের মূল সংস্কৃত, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, তাদেরকে বলা হয় তদ্ভব শব্দ। উদাহরণ–

তৎসম	প্রাকৃত	তদ্ভব	তৎসম	প্রাকৃত	তদ্ভব
অগ্র	অগগ	আগ	বধূ	বহু	বউ
ভক্ত	ভত্ত	ভাত	গাত্র	গাআ	গা
ঘাত	ঘাআ	ঘা	অর্ধ	অদ্ধ	আধ
চন্দ্র	চান্দ	চাঁদ	হস্ত	হত্থ	হাত
অদ্য	অজ্জ	আজ	টঙ্ক	টঙ্কা	টাকা

ঘ. দেশি শব্দ : বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের ব্যবহৃত শব্দসমূহকে বাংলা ভাষয় বলা হয় দেশি শব্দ। বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের সংস্কৃতির কিছু কিছু শব্দ আর্যদের প্রভাবে পরিবর্তিত না হয়ে অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় রক্ষিত আছে, এসব শব্দকে বলা হয় দেশি শব্দ। দেশি শব্দগুলোকে নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে-

১) **জীবজন্তু ও পশুপাখির নাম :** খেঁকশিয়াল, হুতুম, বাবুই, নেংটি, হোল, হাঁড়ি।

২) **ফলমূল ও খাদ্য-দ্রব্য :** বাতাসা, জারুল, হোগলা, মালপো, আমানি, কদু, উচ্ছে, ইচড়, জলপাই, ফোঁপড়, টেপারি, ধুন্দল, থোড়, লাউ, থানকুনি, নটে ইত্যাদি।

৩) **ঘরগৃহস্থালি ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের নাম :** দরজা, সেঁউতি, বাখারি, বাতা, বিচালি, চিমটা, ঢেঁকি, খালই, ঝাঁটা, চাড়ি।

৪) **মাছের নাম :** কাতলা, গজাল, টেংরা, চেলা, পারসে, পোনা, বাটা, লেঠা।

৫) **অন্যান্য শব্দ :** কুড়ি, ডাব, ঝোল, ডোম, মুড়ি, মুলো, টিকারা, দাবা, মল, আটি, ছোকরা, ডিগবাজি, মাঠ, ঠাট্টা, কচি, ঠাসা, পোকা, কানা, মই, যাতা, লাঠি, বাখারি, পেট, ঝাউ, ঝিনুক ইত্যাদি।

ঙ. বিদেশি শব্দ : অন্য ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় আগত শব্দকে এক কথায় বলা যেতে পারে বিদেশি শব্দ। সামাজিক, রাজীনতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত কারণে ভিন দেশের অন্য ভাষার শব্দ বাংলা ভাষায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসি, ইংরেজি, ফরাসি, ওলন্দাজ, জাপানি, চীনা, তুর্কি, বর্মী ইত্যাদি শব্দের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের তালিকা নিচে দেয়া হলো।

আরবি শব্দ :

ক)ধর্মসংক্রান্ত : আল্লাহ, আমানত, আয়াত, আকিদা, আখিরাত, ইবাদত, ওযু, ওয়াজিক, কবর, কালেমা, কোরআন, কিয়ামত, কোরবানি, জাহান্নাম, দুনিয়া, দোয়া, ফরয, মসজিদ, মাদ্রাসা, মুসলিম, মিনার, যাকাত, রসূল, সালাত, সাওম, সুন্নাহ, সীরাত, হারাম, হালাল, হজ্জ, হাওয়া ইত্যাদি।

খ)প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক শব্দ : আইন, আদালত, আলেম, আক্কেল, আমল, আমলা, আমানত, আমির, আসামি, ইন্তেকাল, ইসলাম, ইজ্জত, ঈদ, উকিল, এজলাস, এজাহার, ওয়ারিশ, দোয়াত, কলম, কিতাব, খাজনা, খেসারত,

হিসাব, কবুল, কেতাব, খতম, খেয়াল, গায়েব, জনাব, জমায়েত, জরিপ, জরিমানা, জলদি, জলসা, জুলুম, তালাক, দায়রা, দুনিয়া, মসজিদ, ফাজিল, মালিক, মিনার, মোল্লা, হাজত, হুকুম, হেফাজত ইত্যাদি।

ফারসি শব্দ :

ক) ধর্মসংক্রান্ত শব্দ : খোদা, গুনাহ, দোযখ, নামায, ফেরেশতা, বেহেশত, রোযা ইত্যাদি।

খ) প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ : কারখানা, চশমা, তারিখ, তোশক, দোকান, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ, বান্দা, বেগম, মেথর, রসদ ইত্যাদি।

গ) ফারসি ভাষার অন্যান্য শব্দ : আইন, আজাদ, আদমশুমারি, আমদানি, আসমান, একতারা, এলাচি, ওস্তাদ, কাগজ, কামান, কারবার, খরগোশ, খানসামা, খোশবু, খোশামোদ, গালিচা, গোমস্তা, গোরস্তান, গোলাপ, গ্রেপ্তার, চাকর, চাকরি, জাজিম, জানোয়ার, জিন্দাবাদ, তরমুজ, তোষামোদ, দরবার, দরবেশ, দারোগা, পাইকারি, পালোয়ান, পেশকার, মেহেরবান, রোজগার, সানাই, সৌখিন, সরকার, সালতামামি, হুঁশিয়ার ইত্যাদি।

ইংরেজি শব্দ :

অফিস, আর্ট, এনামেল, কফি, কার্নিস, কলেজ, কেটলি, কেয়ার, কেস, কোর্ট, কোম্পানি, ক্যামেরা, ক্লাব, ক্লাস, গেট, চেয়ার, জেল, টাইপ, জ্যাকেট, টিকিট, টিফিন, টাইপ, টেলিফোন, টেলিভিশন, টেন্ডার, টেলিগ্রাফ, ট্রেন, ডাক্তার, ডিপো, ড্রেন, ড্রাম, ফ্যাশন, ফ্ল্যাট, বোনাস, মাইল, মাস্টার, মিটার, ম্যানেজার, রেল, রেডিও, সার্জন, স্টার, স্টিমার, স্টেশন, হুক, হাইকোর্ট, হাসপাতাল ইত্যাদি।

পর্তুগীজ শব্দ :

আয়া, আচার, আনারস, আতা, আলমারি, আলপিন, আলকাতরা, ইস্পাত, কপি, কামিজ, কামরা, কেদারাা, কেরানি, গামলা. গির্জা, গুদাম, চাবি, জানালা, তামাক, তোয়ালে, নিলাম, পাউরুটি, পিস্তল, পেঁপে, পেয়ারা, ফিতা, বালতি, বারান্দা, বেহালা, বোমা, বোতাম, মালঞ্চ, মার্কা, মাস্তুল, মিস্তিরি, সাগু, সাবান ইত্যাদি।

তুর্কি শব্দ : চাকু, চাকর, দারোগা, কুলি, বাবুর্চি, কোর্মা, খাতুন, বেগম, লাশ ইত্যাদি।
চীনা শব্দ : চা, চিনি, কাগজ, এলাচি, তুফান, লিচু, টাইফুন, হোয়াংহো, নানচি ইত্যাদি।
ওলন্দাজ শব্দ : ইস্কাপন, টেক্কা, রুইতন, হরতন, তুরুপ ইত্যাদি।
ফরাসি শব্দ : আঁশ, ইংরেজ, কুপন, কার্তুজ, ক্যাফে, ওলন্দাজ, বিস্কুট, বুর্জোয়া, রেস্তোরা, শেমিজ ইত্যাদি।
জাপানি শব্দ : রিকসা, হারিকিরি, প্যাগোডা, সাম্পান, হাস্নাহেনা, নিপ্পন, টোকিও ইত্যাদি।
বর্মী শব্দ : লুঙ্গি, ফুঙ্গি, কিয়াং, আরাকান, ইয়াঙ্গুন ইত্যাদি।
রুশ শব্দ : বলশেভিক, সোভিয়েত, স্পুৎনিক ইত্যাদি।
ইতালিয় শব্দ : রোম, ম্যাজেটা।
গ্রিক শব্দ : দার্খমে– দাম, গোনোস– কোণ, কেন্টর– কেন্দ্র ইত্যাদি।
মিশরীয় শব্দ : মিসরি-মিছরি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. গঠন অনুসারে শব্দ কয় প্রকার?

ক) দুই
খ) তিন
গ) চার
ঘ) পাঁচ

২. যেসব শব্দকে ভাঙ্গা বা বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে কী শব্দ বলে?

ক) যৌগিক শব্দ
খ) রূঢ়ি শব্দ
গ) তদ্ভব শব্দ
ঘ) মৌলিক শব্দ

৩. ভাষার মূল উপকরণ কোন শব্দ?

ক) যৌগিক　　খ) মৌলিক

গ) তদ্ভব　　ঘ) সাধিত

৪. সাধিত শব্দ কয় প্রকার?

ক) তিন　　খ) চার

গ) পাঁচ　　ঘ) কোনটিই নয়

৫. অর্থগতভাবে বাংলা শব্দসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

ক) দুই　　খ) তিন

গ) চার　　ঘ) পাঁচ

৬. মহাযাত্রা শব্দের ব্যবহারিক অর্থ কোনটি?

ক) মহাসমারোহে যাত্রা　　খ) মৃত্য

গ) বিশাল পথের যাত্রা　　ঘ) দূরত্বের যাত্রা

৭. কোনটি রূঢ়ি শব্দ ?

ক) জলধি　　খ) বাঁশি

গ) কর্তব্য　　ঘ) মহাযাত্রা

৮. সমাসনিষ্পন্ন যেসব শব্দে তৃতীয় অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে কী শব্দ বলে?

ক) মৌলিক　　খ) যোগরূঢ়

গ) যৌগিক　　ঘ) রূঢ়ি

৯. কোনটি যোগরূঢ় শব্দ

ক) বাবুয়ানা　　খ) জলধি

গ) তৈল　　ঘ) পাঞ্জাবি

১০. তৎসম শব্দের অর্থ কী?

ক) তার (সংস্কৃতের) সমান　　খ) বাংলা ভাষার সমান

গ) সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন　　ঘ) অন্য ভাষার সমান

১১. প্রাকৃত শব্দের অর্থ কী ?

ক) প্রকৃত　　খ) পুরাতন

গ) স্বাভাবিক　　ঘ) যা করা হয়েছে

১২. হরতাল কোন ভাষার শব্দ ?

ক) গুজরাটি　　খ) তুর্কি

গ) হিন্দি　　ঘ) গুজরাটি

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শব্দ কাকে বলে? গঠন অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।

২. অর্থ অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ব্যাখ্যা করুন।

৩. উৎপত্তি অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক　২. ঘ　৩. খ　৪. ঘ　৫. খ　৬. খ　৭. ক　৮. খ　৯. খ　১০. ক　১১. গ　১২. ক